কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু

সনৎ কুমার কর

কথা বলার সমস্যা
ও
প্রতিবন্ধী শিশু

সনৎকুমার কর

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতন, কলকাতা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৯০
১৭ই মার্চ ১৯৮৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ঃ ১২ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীচন্দনকুমার বক্সী
প্রিন্টিং সিন্ডিকেট
৮, মদন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ঃ একটি নূ্যন-শ্রুতি শিশুকে শ্রুতি-বর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে কথা শেখান হচ্ছে (কেয়ার ও কাউনসেলিং সেন্টারের সৌজন্যে)।

উৎসর্গ

অধ্যাপক সরসীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে

প্রতিবন্ধীদের পরিসেবায়
যাঁর কাছে আমার
হাতেখড়ি

স. ক.

মুখবন্ধ

সনৎকুমার কর একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী। গত সাত বছর ধরে তিনি স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতনের বাক্‌শ্রুতি বিভাগের সংগে যুক্ত। তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধগুলি। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার দিকে তাকিয়ে এ সব লেখা। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ করে বাকশ্রুতি ত্রুটিযুক্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে পিতামাতা বা অভিভাবকদের অনেক কিছু জানার আছে। সহজ বাঙলা ভাষায় সনৎ বাবু সেই সব কথাই বলতে চেয়েছেন। আশা করি, পাঠকবর্গ লেখাগুলি পড়ে উপকৃত হবেন।

ইতি—

অজিতা চক্রবর্তী

অধিকর্তা

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতন

কলকাতা

ভূমিকা

বুদ্ধি মানুষের টিকে থাকার মূল হাতিয়ার। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রগতি থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র বুদ্ধির প্রকাশ, প্রভাব ও লড়াই। বুদ্ধির ঘাটতি তাই মানুষের জীবনে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। অল্পবুদ্ধি শিশুদের নিয়ে তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই।

কথা—বুদ্ধির চরম উৎকর্ষতার প্রতীক। বধির ও ন্যূন-বুদ্ধি শিশু দুজনেরই কথা বলার হ্রস্বতা আছে। এই অক্ষমতা কিন্তু একজন বধিরকে যতখানি আঘাত করে, একজন মানসিক প্রতিবন্ধীকে ততটা নয়। শুনতে-না পাওয়ার ঐশ্বর্য-বঞ্চিত শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা সবই সীমিত হয়—তার বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তাকে সঙ্কুচিত জীবনযাত্রা মেনে নিতে হয়। এরা অল্প-বুদ্ধি না হয়েও সীমাবদ্ধ মানসিক বিকাশের শিকার। আর অপূর্ণ বিকাশ, আরও সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত জীবন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ পরিণতি। এই দুই রকম শিশুর সমস্যা বর্তমান গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য।

মানস-মন্দিত শিশুদের বুঝতে হলে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়। সে কারণে প্রথম প্রবন্ধ। এটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি, শিশুর সংগে তার মা-বাবার সম্বন্ধ সম্পর্কে। অল্প-বুদ্ধি শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক গঠনে মা-বাবার ভূমিকা কি রকম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এখানে দেওয়া উদাহরণ দুটি তার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় নিবন্ধ শিশুর কথা শেখার গল্প ও তার সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রকম সমস্যা সম্পর্কে। কথা বলার এক বিশেষ ত্রুটি—তোতলামি—যা ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিক জীবনকে ব্যাহত করে ও সংগে আনে হীনমন্যতা—পরের প্রবন্ধ সে বিষয়ে একটা সম্পূর্ণ আলোচনা।

পঞ্চমটি মানস-মন্দিত শিশু সম্পর্কে। এ সম্বন্ধে ধারণা ও তার নিরূপণ, মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ—শুরু ও বর্তমান এবং পশ্চিমবঙ্গে এই সব শিক্ষা কেন্দ্রের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে একটা ব্যাপক আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্তে আছে কিছু বাস্তব পরামর্শ ও কেন্দ্রগুলির তালিকা। পরের প্রবন্ধটি বুদ্ধিমাপার পদ্ধতি বিষয়ে। তার শুরুর ইতিহাস, বিবর্তন, উপাদান, বৈজ্ঞানিক মান, বিভিন্ন ধারণা—যেমন বুদ্ধি কি, বুদ্ধির ধ্রুবক কি করে হিসাব করা হয়, মানসিক বয়স কাকে বলে—ইত্যাদি এবং এদের ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা বিশদ আলোচনা। এটি আগেরটির পরিপূরক।

সপ্তম প্রবন্ধ—শিশুদের এক দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি—অটিজম্ সম্পর্কে।

অটিস্টিক শিশুদের দুই তৃতীয়াংশ মানসিক প্রতিবন্ধী হিসাবে থেকে যায়—কথা বলার ত্রুটি যাদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কিন্তু অন্য অল্পবুদ্ধি শিশুদের থেকে এদের আলাদা করে দেখা প্রয়োজন, কারণ এদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ধারাটা আলাদা।

অষ্টম ও শেষ নিবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৮১ সালে—আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসর উপলক্ষে। প্রতিবন্ধীদের সামগ্রিক ও সাধারণ সমস্যার কথা এখানে বলা হয়েছে। সব শেষে আছে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধী কল্যাণব্রতী সংস্থাগুলির নাম।

রচনাগুলির কয়েকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধু অধ্যাপক সুদেব সানা (কবি অনির্বাণ রায়চৌধুরী) ও ডঃ রমেন মজুমদারের আগ্রহে ও উৎসাহে এই বই প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। কিছু মালমসলা এবং মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি সহকর্মিণি শ্রীমতী রেখা রায়, বাসন্তী রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত-কুমার মাইতির কাছ থেকে। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পড়ে মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন অধ্যাপিকা অজিতা চক্রবর্তী। সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা রইল সেইসব শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী বন্ধুদের যাদের কাছে আমি শিখছি আর শিখছিই—যাদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। ছবিগুলি কেয়ার অ্যান্ড কাউনসেলিং সেন্টার ও শ্রীমতী অনিতা করের সৌজন্যে পাওয়া। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর জানাই এস এস কে এম হাসপাতাল, স্পীচ্ অ্যান্ড হীয়ারিং ইনস্টিটিউট, সরকার পুল মানসিক হাসপাতাল ও মানস কে। ধন্যবাদ রইল শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থর জন্য, যাঁর বিজ্ঞানপিপাসু ও দরদীমনের ছোঁয়া না লাগলে এই বই প্রকাশ পেত না।

প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। সেটা আবিষ্কার ও উপলব্ধির ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

কলকাতা—
২৬শে জানুয়ারী ১৯৮৪।

সনৎকুমার কর

সূচীপত্র

১ | শিশুর মানসিক বিকাশ

[প্রথম পাঁচ বছর]

১৯৭৯ সাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। এই উপলক্ষে আমাদের দেশে নানা রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। শিশুর প্রথম পাঁচ বছর মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যক্তিত্বের ভিত গড়ে ওঠে এই সময়। জন্মাবার পর শিশু থাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা পুঁটুলি। কান্না, হাত-পা নাড়া, খাওয়া ও প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারা সবই স্বয়ংক্রিয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া—ঊর্ধ্ব মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণহীন। আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকগুলি থাকে প্রধান। ক্রমশঃ স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াগুলি সংলগ্ন হতে থাকে বহির্জগতের নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে। বাইরের উদ্দীপকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও তার ক্রম-প্রাধান্য শিশুর মানসিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত। শিশুর খিদে পায় (শরীরে একটা অস্বস্তি অনুভব করে)—সে কাঁদে—মা আসে—দুধ দেয়—সে খায়—শান্ত হয় (তার কষ্ট যায়। শরীরে একটা তৃপ্তি আসে)। এই ব্যাপার থেকে কতকগুলো নতুন ছোট ছোট প্রতিবর্তক ক্রিয়া (বা চক্র) সৃষ্টি হয়। যেমন—কাঁদলে দুধ আসে, কাঁদলে মা আসে। দুধ মানে কষ্টের শেষ। মা মানে কষ্টের শেষ। দুধ আনে আনন্দ। মা আনে আনন্দ। দুধ খেয়ে শিশু হাসে। দুধ দেখে শিশু হাসে। মাকে দেখলে শিশু হাসে। প্রতিবর্তক ক্রিয়া থেকে মানসিক ক্রিয়া শুরু হল।

ছবি ১.১ : বয়স ৪ মাস। উপুড় হয়ে খেলা।

শেখার শুরু—মানসিক ক্রিয়ার শুরু—আনন্দ দিয়ে—আরাম দিয়ে—দুঃখ নাশ করে, কষ্ট লাঘব করে। এ ক্রিয়া প্রথম তার শরীরকে কেন্দ্র করে। শিশু তার

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে। নিজ শরীর-জাত বিভিন্ন বস্তু দেখে। দেখার জন্য চোখ, কিন্তু বুঝে দেখার জন্য তার মুখটাই প্রথমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যা পায় মুখে পোরে—খাদ্য ও অখাদ্য, নরম বা শক্ত। পরে সে শুধু হাত দিয়ে কঠিন বা অখাদ্য বস্তু আলাদা করে। আরও পরে শুধু চোখ দিয়ে। পার্থক্য, বিচারবোধের উন্মেষ এমন করেই হয়। এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে অন্য ইন্দ্রিয়। অনেক পরে তা হয় বিমূর্ত। এ ক্রিয়া চলে আমৃত্যু, কারণ এর সঙ্গে জড়িত গ্রহণ ও বর্জন।

শিশু আট থেকে দশ মাস বয়সে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। পরে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখে। তার জগতের পরিধি বাড়ে। সে অনুসন্ধান করে বেড়ায় বস্তু জগতে। চার পাশের বস্তু ও প্রাণীদের চিনতে শেখে। জীবজন্তু ও মানুষের গলার স্বর, প্রাকৃতিক শব্দ বা বিভিন্ন জিনিসের আওয়াজ নকল করে, কথা বলে। এবং কথা বলতে আরম্ভ করে—নিজে নিজে এবং অন্যের সঙ্গে।*
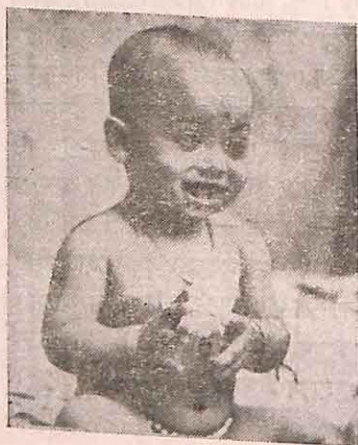
ছবি ১.২ : বয়স ৮ মাস। বসে খেলা। হাতে ফিল্মের বাক্স।

বহির্জগতের উদ্দীপক—শুধু মার স্পর্শ (বা দুধের স্বাদ) নয়, মার কণ্ঠস্বর, অন্যান্য শব্দ, আলো-উত্তাপ সবই শিশুকে ছুঁয়ে যাচ্ছে ও সে সাড়া দিচ্ছে। প্রথম প্রথম এই সাড়া সামগ্রিক—সারা শরীর দিয়ে—পরে আঞ্চলিক—শরীরের বিশেষ অঙ্গ দিয়ে। যেমন, জোরে শব্দ হলে (একটা থালা মাটিতে পড়ে গেলে) প্রথম প্রথম শিশুর সারা শরীর চমকে নড়ে ওঠে। পরে সে ঘাড় ঘুরিয়ে উৎসটা দেখবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট উদ্দীপক, সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া থেকে আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া—এই বিবর্তন ঘটে।

মা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিশু অসুস্থ হয় এবং তা অন্য জাগতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মাকে চিনতে পারার পর এই বিচ্যুতি দীর্ঘ সময়ের হলে (মায়ের মৃত্যু বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিত) শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে যৌথ পারিবারিক কাঠামোয় মাতৃহীন অবস্থার সম্ভাবনা কম। একক পরিবারগুলিতে মার থেকে শিশুর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বেশী এবং তা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ও করছে। আবার মার থেকে বিচ্ছেদের প্রয়োজন

* এ বিষয়ে অন্য প্রবন্ধ আছে।

আছে, নির্ভরশীলতা থেকে স্বনির্ভরতায় উত্তরণের জন্যে। তবে তা হওয়া উচিত ধীরে ধীরে ও সহজভাবে।

এ ব্যাপারে দুধ ছাড়ান একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইউরোপে সাধারণতঃ এক বছর বয়সে শিশুকে মার দুধ ছাড়ান হয়। আমাদের দেশে বাচ্চারা দুধ খায় দুবছর বা অনেক সময় পাঁচ বছর পর্যন্ত অথবা যতক্ষণ না পরেরটি জন্মাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বা দেরী করে ছাড়ান দুটোই অবিধেয়। তাই ব্যাপারটি হওয়া উচিত সহজভাবে ও ধীরে ধীরে। কিছু মা আছেন যাঁদের ব্যক্তিত্বের অপূর্ণতা এ পর্যায়টিকে জটিল করে তোলে।

ছবি ১.৩ : বয়স ১ বছর ৮ মাস।
"বুনুকে বেড়াতে নিচ্ছি"।

খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অন্যান্য অভ্যাস গড়ে ওঠে, যেমন তার দেহজ-ময়লা নিঃসরণের ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে একটি সাধারণ শিশুর সাধারণতঃ দুবছর বয়সে এই ক্রিয়াগুলি তার উর্ধ্ব-মস্তিষ্কের সচেতন নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। প্রশিক্ষণের বা শিশুর বুদ্ধির ন্যূনতার কারণে পুরনো অভ্যাস থেকে যেতে পারে। প্রথম দুবছর যে সব আবেগজাত সমস্যা আমরা তার জীবনে দেখতে পাই তা হল ঃ আঙুল চোষা, বমি, পেটখারাপ, চুলকনা, হাঁপানি, আংশিক বধিরতা, চঞ্চলতা, আগ্রাসী মনোভাব, বিছানা ভেজান, অন্তর্মুখীনতা, রাগ, জেদ, নিজেকে বা অপরকে আঘাত করা, কথা বলতে না-শেখা, হাঁটতে চলতে না শেখা, শক্ত খাবার না-খাওয়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে মার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে মা সচেতন হলে এই সব সমস্যা এড়ানো সম্ভব। মাকে বুঝতে হবে যে নিজেকে ও মাকে ঘিরেই শিশুর মনোজগত। তার সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে মার দ্বারা। তাই সে অত্যন্ত নির্ভরশীল মার উপর। অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থেকে আসক্তি আসে। মার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাকে স্বার্থপর করে তোলে। সে মনে করে মা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি। কাউকে সে ভাগ দিতে চায় না। অন্যান্য ভাই-বোন ও বাবা সম্পর্কে ঈর্ষা ও রাগ জন্ম নেয়—কখনও বিদ্বেষ বা হিংসাও দেখা দেয়। মনের যে অংশটাকে আমরা বিবেক বলি, তা গঠনের সময় এটা। মার প্রতি আসক্তি ও বাবার প্রতি (বা অন্যান্য ভাই-বোনদের প্রতি) বিদ্বেষ এই দুই মনোভাবের সুষম সমাধান শিশুর বিবেক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবং এই

সমাধানের উপর তার ভবিষ্যত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে নির্ভর করে। তথাকথিত —ভালছেলে, নারীবিদ্বেষী, বাবার মত হওয়া, সমকামিতা, রোমন্থক চিন্তাধারা, শিশুসুলভ আচরণ, মার মত হওয়া (মেয়েলি হওয়া) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের গোড়া এখানে। মেয়েদের বেলায় মোটামুটি একই জিনিস ঘটতে পারে শুধু আসক্তির পাত্রটা যায় বদলে আর ঈর্ষা আর রাগ জম্মায় মার প্রতি। এই পর্যায়ের সমাধানের উপর ছেলেদের মত তাদেরও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। মানসিক বিকাশের এই স্তরে বিঘ্ন ঘটলে শিশু প্রত্যাবর্তন করে তার পুরনো অভিযোজনের অবস্থায়। ছোটবেলার সমস্যাগুলির সঙ্গে যোগ হতে পারে তোতলামি, ভয় পাওয়া, কথা বন্ধ করে দেওয়া, খাওয়া-দাওয়ায় অনাগ্রহ, রাগে মেঝেয় গড়াগড়ি দেওয়া, বা বেশী শান্ত হয়ে যাওয়া—অর্থাৎ নিজেকে সে গুটিয়ে নেয় বাইরের জগৎ থেকে।

বয়স অনুযায়ী ব্যবহার না হোলে শিশুকে সাধারণ বা স্বাভাবিক বলা যায় না। পাঁচ বছরের ছেলে ২/৩ বছরের মত ব্যবহার করলে তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বা ঠিকমত বললে বলতে হয় অবস্বাভাবিক। পাঁচ বছর বয়সে সাধারণ শিশুরা মোটামুটি ছোটখাট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা হয়ে যায়।

শিশুর ব্যবহারিক সমস্যায় তাই দুটো জিনিস দেখা দরকার—তার বুদ্ধির ঘাটতি আছে কিনা, না সমস্যাটা আবেগ-ঘটিত। বুদ্ধির ঘাটতি মাপবার নানারকম ব্যবস্থা ও মাপকাঠি আছে।* পিতামাতার এটা বোঝা দরকার যে, যা অস্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক করা যেতে পারে—অবস্বাভাবিককে নয়। অতএব এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হতে হবে এবং শিশুর গুণগত স্তরের উপর নির্ভর করবে তার ভবিষ্যত শিক্ষা ও পেশার পরিকল্পনা।

বাবা-মা, শিক্ষক ও অন্যান্য যাঁরা শিশুর বিকাশ ও উৎকর্ষের জন্য ভাবেন ও কাজ করেন তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন থাকলে অনেক ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়। অনেক সময়ই মুস্কিল হয় ; (১) অসুবিধাটা ধরা পড়ে না। (২) ধরা পড়লেও এবিষয়ে গা করা হয় না ও (৩) কোথায় এবিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যায় অনেকেই জানেন না। শিশুর খাওয়াদাওয়া, ঘুম, হাঁটা, কথাবলা ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করলে তা স্বাভাবিক কিনা বোঝা কষ্টকর নয়। এবিষয়ে মাকেই বেশী সচেতন হতে হবে, কেননা শিশুর প্রথম পাঁচ বছর কাটে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য পড়ানো হয়। তাঁদের ও সাধারণ চিকিৎসকদেরও এবিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। কলকাতার বড় হাসপাতালগুলিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। সমাজ কল্যাণকর্মী এবিষয়ে যথাযোগ্য সাহায্য করবেন।

আমাদের দেশের আইনে আছে পাঁচ বছর বয়সের পর শিশুর অভিভাবক তার বাবা। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মাদের কষ্ট দেবার জন্য অনেক বাবা (ছেলেকে মানুষ করার দাবিতে বা অজুহাতে) ছেলে কেড়ে নেয়। অথচ পাঁচ বছর পরই মার

* এ বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ আছে।

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, এমন নয়। ছেলে যদি হয় একমাত্র, তাহলে অবস্থা বেশ করুণ। মাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়। কারণ তার পক্ষে আর একটা বিয়ে করা তত সহজ নয়, যত সহজ বাবার পক্ষে। ছেলেটা পড়ে বিমাতার খপ্পরে। সব বিমাতা কুমাতা নয় কিন্তু বেশীর ভাগই—বিশেষ করে আপন সন্তান হবার পর। তাই ভাগ্যহীনা এক সন্তানের জননী, স্বামী-বিচ্ছিন্নাদের স্বার্থে এবং শিশুর স্বার্থে আইনটি নিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ভাববার আছে।

সারণী ১.১ঃ শিশুর বিকাশের কয়েকটি নির্দেশক

বয়স	নির্দেশক
৩-৪ মাস	কান্না-হাসি, মাকে চেনা।
৪-৬ মাস	উপুড় হওয়া, জিনিসপত্র ধরা ও চেনা।
৬-৮ মাস	বসা, চেনা-অচেনা বোধ, ভয় ও রাগ।
৮-১০ মাস	হামাগুড়ি দেওয়া, মুখ দিয়ে শব্দ ও অন্যান্য অনুকরণ করা।
১২-১৫ মাস	হাঁটা, কথা বলা, ছোটখাট নির্দেশ পালন।
২ বছর	ছোট বাক্য, খাদ্য-অখাদ্য বিবেচনা, নাম দিয়ে জিনিস চেনা, বিছানা না ভেজান।
৩ বছর	পোশাক খোলা, বাধা অতিক্রম, অভিজ্ঞতা বলা, যন্ত্রের ব্যবহার (কাঁচি), চাহিদা (খিদে ও অন্যান্য) বলা।
৫ বছর	পোশাক পরা, লিখতে-পড়তে পারা, দলবদ্ধ খেলা, মুখ-হাত ধোয়া, বাড়ীর ছোটখাট কাজ করা, ভালমন্দ জ্ঞান, আপন-পর জ্ঞান, অন্যের জন্য ভাবনা, দুঃখ, আনন্দ, রাগ ও ভয়।

যে বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

কেনেথ সোডি ঃ ক্লিনিক্যাল চাইল্ড সাইকিয়াট্রি, বেলারি, টিনড্যাল ও কক্স, লণ্ডন ১৯৬০।

২ মাতাপিতার ভূমিকা

ব্যাঙ্গালোরে সর্বভারত মানসিক স্বাস্থ্য নিকেতনে শিক্ষাকালে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাঃ মূর্তিরাও-এর প্রশিক্ষণ শ্রেণীতে একটা ছেলের বিবরণী উপস্থিত করেছিলাম। মনে পড়েছে ছেলেটির ইতিহাস শেষ হ'লে বিধিব্যবস্থা পড়তে যাব, ডাঃ মূর্তিরাও বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আমাকে এক কথায় বলো, একে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?' জবাব লেখাই ছিল। মুখে বললাম, 'আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হ'বে ছেলেটির বাবা-মার খোঁজ করা।' অধ্যক্ষের মুখে বুঝি একটু ক্ষীণ হাসি খেলে গেল। পরক্ষণেই গম্ভীরতর হ'য়ে তিনি বললেন, 'আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হ'বে—তার বাবা-মাকে খুঁজে বার করতে। গৃহছাড়া, পথহারা বালক আজ পাঁচ বছর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং অবশেষে তাকে মানসিক আরোগ্যশালায় দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

বছর পনেরর স্বাস্থ্যবান, গৌরাঙ্গ ছেলেটি, কেবল হিন্দী বলতে পারে। (ধরে নেওয়া যাক, ভোলা তার নাম) মহীশূর প্রদেশের এক সংশোধনী বিদ্যালয় ছেলেটিকে আমাদের হাসপাতালে পাঠায়। অভিযোগঃ চুপচাপ ও বিমর্ষভাব, খাদ্যগ্রহণে অনাসক্তি, কক্ষে ও বিছানায় প্রস্রাব ও বাহ্যে করে ফেলে এবং ঘুম হয় না। হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর ওর উন্নতি দেখা যায়। পুলিসের বিবরণী ছিলই। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে আরও ইতিহাস সংগ্রহ করি। উত্তর প্রদেশে আলিগড়ের কাছাকাছি ভোলার বাড়ী। পিতা পেশায় কর্মকার। ভাই-বোন তিনচারজন। বেশীর ভাগ সময়ই ওরা রাস্তায় খেলা করে কাটাত। কিছুদিন এক মৌলবীর কাছে সামান্য পড়াশুনা করেছিল। কিন্তু পড়ার থেকে রাস্তার ডাক ছিল তার বেশী। বাবা-মা সময় পেত না ওদের উপর সর্বদা নজর রাখতে; একদিন, আজ থেকে প্রায় বছর পাঁচেক আগে ওর বয়স তখন দশ, বাড়ীর অনতিদূরে রেলস্টেশনে এসে সে ট্রেনে চড়ে বসে। তারপর পাঁচবছর ধরে ভোলা বাড়ী ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজছে। পায়নি। প্রথম হাজির হয় কোলকাতা, পরে আসাম। তারপর জামালপুর এবং আবার কোলকাতা। সেখান থেকে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ হয়ে অন্ধ্র। অন্ধ্র-মহীশূর সীমান্তে মহীশূর পুলিস ওকে ধরে, রাস্তায় ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। শাসক-বিচারকের কাছে হাজির করা হ'লে অল্পবয়সের জন্য ওকে সংশোধনী বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেবার আদেশ হয়। সেখানেই এসেছে ছ'মাসের ওপর। ইতিমধ্যে পাঁচবছর কেটে গেছে। ভোলার দিন কেটেছে পথে-প্রান্তরে, ট্রেনের কামরায় ও

স্টেশনে এবং ধরে নিতে পারি কখনও বা হাজতে এবং জুয়ার আড্ডায়। এসেছে কত সাধু ও অসাধু লোকের সংস্পর্শে। কাটিয়েছে বা ভিখিরী ও অসামাজিকদের সঙ্গে। হয়তো কখনও কোন সহৃদয় লোক ওকে পাঠিয়েছে বাড়ীর পথে। কিন্তু ভাগ্য ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর অল্প বুদ্ধি (যা পরে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় বোঝা গেছল) ওকে অনুসরণ করতে সামর্থ্য দেয়নি একটা সুষ্ঠু পরিক্রমা। সে ভ্রান্ত হয়েছে। বিপথচালিত হয়েছে। অপরের ক্রীড়নক হয়েছে। নানা ধ্যানধারণার ও ভাষার লোকের মাঝে এসেছে। খাদ্য, আবহাওয়া, পরিপার্শ্ব পৃথক। তারপর সংশোধনী বিদ্যালয়ের নিয়মকানুনের আওতায় এসেছে। অল্পবুদ্ধি হলেও আর মেলাতে পারেনি। মিশাতে পারেনি আপনাকে আর সকলের সঙ্গে। একীকরণ ও সমীকরণের শেষ সীমায় পেঁছেছে ও। মানসিক ভারসাম্য ওর টুটে গেছে। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। অল্পবুদ্ধি হওয়ার জন্য ওর আবেগের ধারটা অবশ্য ভোঁতা। তবুও আগ্রহ লক্ষ্য করেছি বাড়ী ফেরার। উত্তর প্রদেশের সেই অখ্যাত স্টেশনের কাছে কর্মকার পিতা ও কর্মনিরতা মাতার কাছে, যারা তাকে ভালো করে দেখবারও সময় পেতো না, তাদের কাছেই তার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হ'ত। শুধু জানত না, এই ইচ্ছেটা কেমন ক'রে কার্যকর করা যায়। সে বিচ্ছিন্ন, বিচ্যুত। তার চেনা জগৎ সরে গেছে তার কাছ থেকে। সে উদভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ক্লান্ত ও অসহায়। তাই ডাক্তার মূর্তিরাও-এর প্রশ্নের জবাবঃ সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হবে পিতামাতা থেকে এই চ্যুতি বিনষ্ট করা। তাকে তার বাপ-মার কাছে ফেরত পাঠানো। ভোলার পক্ষে যতখানি মানুষ হওয়া সম্ভব, তা সর্বাগ্রিম মানবিক ও নিদান শর্ত তাকে তার পিতামাতার সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু লক্ষণের চিকিৎসা সম্পূর্ণ নিরাময়ের একমাত্র কথা নয়। তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে তাকে পুনঃস্থাপন করলে তবেই যথার্থ কর্তব্য করা হ'ল।

আশা করি, এই উদাহরণ থেকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি—পিতামাতার সাহচর্য শিশুর পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের অভাব শিশুর মানসিক বৃদ্ধিকে কতটা পঙ্গু করে দিতে পারে এ সম্পর্কে বাউলবি-র (Bowlby) গবেষণা শিশু মানসিক নিদানতত্ত্বে আলোড়ন তুলেছিল। এ বিষয়ে অন্যান্য কর্মীর মধ্যে স্পিৎস্-এর (Spitz) কাজ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে, অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমনা, সমাজ-অপাংক্তেয় মা—অমাতৃক অবস্থা অথবা সেবিকামাতার থেকে শ্রেয়। অল্পবুদ্ধি ও সমাজ-অপাংক্তেয়া এই আপন মাতারা নিজের শিশুর মানসিক ও শারীরিক প্রয়োজন, গতি ও বৃদ্ধি যত সহজে বোঝে এবং সেইমত কাজ করে, তেমন আর কেউ নয়। মাতৃচ্যুত হ'য়ে পড়লে শিশুরা আপনাকে গুটিয়ে নেয় অথবা বিষাদগ্রস্ত হয়। হাসে না, খেলে না, কাঁদে বা ঘ্যানঘেনে হয়ে পড়ে। কখনও বা চুপচাপ নির্বিকার উদাসীন হয়ে যায়। তখন সে আপন মনেই আপন জগৎ সৃষ্টি করে। বাইরের জগৎ যায় মুছে। তার এই মানসিক পরিবৃত্তের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ যায়

যুচে। শিশু অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনুষ্যেতর প্রাণী জগতেও এমন ঘটনার নজির আছে।*

প্রশ্ন উঠবে কত বয়সে শিশু মা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে এবং এই বিচ্ছিন্নতা অন্ততঃ কতদিনের হ'লে তা ক্ষতিকারক হ'তে পারে? ছ'মাস থেকে দু'বছর? না দুই থেকে পাঁচ? দেখা গেছে মায়ের অনুপস্থিতির নানান দিক আছে। মা কি? এ একটা মস্ত বড় প্রশ্ন—শুধু খাদ্য সরবরাহক—না স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ ও রূপের সংবেদন সঞ্চারে কিশলয়—ইন্দ্রিয়, তথা মনের ক্রম-উন্মেষক? শিশুর তিন-চার মাস বয়সে আপন মনের হাসি ক্রমে বিলুপ্ত হয়; মায়ের হাসিতে সে হাসে, মায়ের গলা চিনতে পারে। একটা নির্বোধ খাদ্য সংগ্রহকারী ক্রমে চিনতে শেখে মাকে সম্পূর্ণ একটা আলাদা বস্তুরূপে। মা-ই শিশুর জগতে প্রথম বস্তু। ক্রমে ক্রমে শিশু জাগতিক তাবৎ বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং মাকে চিনবার আগে ততটা ক্ষতি নয়, যতটা পরে। চেনার পরে বিচ্ছেদ বড় বেশী করে বাজে। আর স্বভাবতঃই অল্পদিনের বিচ্ছিন্নতায় স্থায়ী ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা কম।

অমাতৃক অবস্থা ভারতে সংখ্যায় অল্প। কারণ তার সমাজগঠন। তার যৌথ পরিবার। মায়ের পরিপূরক এখানে অল্প আয়াসেই লভ্য। ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য বহুমাতৃত্ব। এক মাতা থেকে বহু মাতা। মাতা কথাটা এখানে রূপার্থক ও কর্মার্থক। ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, কাকীমা, মাসীমা ইত্যাদিতে আমাদের ঘর ভরে আছে। ভাষাগত লক্ষণও লক্ষণীয়ঃ মা শব্দটির বহুল সংযোজন। ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর মস্ত যোগ। মাতৃপূজক বঙ্গদেশে কথাটির যাথার্থ্য সর্বাধিক। আজ বস্তুতান্ত্রিক ও শিল্পপ্রধান সভ্যতার দ্রুত প্রসারে তাতে চিড় ধরেছে। যৌথ থেকে একক পরিবার। তাই মাতার অনুপস্থিতিতে মাতৃহারা শূন্য গৃহ। শিশুর জগৎ অমাতৃক। তার মনোজগতের ক্রমিক ও সুষ্ঠু বিকাশ বিপর্যস্ত।

মায়ের সঙ্গে শিশুর বহির্জগতে সর্বপ্রথম সংযোগ মাতার হাত ও স্তনের মাধ্যমে। হাত যোগায় স্পর্শ। স্তন যোগায় স্পর্শ ও খাদ্য। খাদ্য শরীর পোষণে সর্বপ্রধান সামগ্রী। মাতৃস্তনে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন সমাধিত। প্রথম এবং প্রধান বলে এই দুধ খাওয়া ও খাওয়ানোর মস্তবড়ো গুরুত্ব আছে মায়ের ও শিশুর মনোজগতে। এই ব্যাপারটা এত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বভাবজ যে সংবাদপত্রে কৌতূহল উদ্দীপক খবর দেখতে পাওয়া যায়। জাপানে মোটর দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক মহিলা হাসপাতালে থাকার সময় সন্তান প্রসব করেন। সন্তানকে তার কাছে দেওয়া হ'লে অজ্ঞান অবস্থায়ও তাকে জড়িয়ে ধরে দুধ খাওয়ান। আর একটি খবরে দেখা গেল সতের বছরের

* হারলো (Harlow) বাঁদর বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে তারের তৈরি ও কাপড়ের তৈরি দুধের বোতল লাগান মেকী মা'র দ্বারা বড়-করা বাঁদররা সামাজিক ও যৌন জীবনে স্বাভাবিক আচরণে অপারগ।

সন্তানসম্ভবা এক তরুণী ঘুমন্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। দু'মাস পরে শিশু জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। নবজাতকের কণ্ঠস্বরে তিনি উঠে বসেন।

দুধ ছাড়ানোও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিশুর ও মায়ের দুয়েরই পক্ষে। ইউরোপে স্তনদান সাধারণতঃ শিশুর নয় থেকে বারো মাস বয়সে সমাপ্ত। তারপর তাকে বাইরের কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে শেখান হয়। ভারতে শিশুরা সাধারণতঃ দু'বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করে। কখনও এটা বেড়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত চলে। যেমন, একমাত্র সন্তান অথবা কনিষ্ঠের বেলায়। বেশীদিন স্তনপান করলে সন্তান মাতৃ আসঙ্গিত হয়। মায়ের ছেলে বা দুধের ছেলেটি হ'য়ে থাকে। স্বাধীন স্বকীয় সত্তার স্ফুরণে বাধা বা বিলম্ব হয়। এমন মা-ও আছেন যারা সন্তানকে খোকাটি বা খুকুটি করে রাখতে চান এবং তা'তে আনন্দ পান। বনহুগলীতে বিকলাঙ্গ শিশু আরোগ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে দেখা একটা উদাহরণ দিই। অল্পবুদ্ধি একটি বছর দশেকের বালককে নিয়ে তার মা আসেন ওখানকার বহির্বিভাগে দেখাতে। স্বাস্থ্য ছেলেটির ভালই। অথচ অস্পষ্ট 'মা বাবা' ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। হাঁটতে পারে, কথা বুঝতে পারে। ছোটখাটো নির্দেশ 'থালাটা আনো', 'জল খাও', 'বোনকে মেরো না'—বোঝে ও শোনে। অথচ ছেলেটি নাকি জামাকাপড় পরতে বা ছাড়তে পারে না, স্নানাগারে যেতে পারে না, নিজের হাতে খেতে পারে না। ছেলেটির শিশুর ভঙ্গী। সর্বদা মা'র কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। মাকে মনে হল না তিনি ব্যাপারটিতে ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শেষে অবশ্য জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলে ভাল হ'বে কিনা। পরিষ্কার ভাষায় আমাদের মতামত জানালাম। বিচলিত হলেন না তিনি। নিম্নমধ্যবিত্ত নিরক্ষর মহিলা। হেসে বললেন, 'দেখুন না, একমাত্র ছেলে। এর উপরে দু'টো মেয়ে, নীচেও একটা।'—বলে ছেলেটিকে আদরে জড়িয়ে ধরলেন। ছোট বাচ্চার মত ছেলেটা মা'র কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরল। আমি ডাকতে এলো না, হেসে আদুরেভাবে মাথা দোলাতে লাগল। আসলে, শেখালে সে পূর্বোক্ত সব কাজগুলো নিজে নিজে করতে পারবে। আমাদের তাই দৃঢ় ধারণা। শিশুটি এসব শিখলে মায়ের 'পুরুষ শিশু' পেতে থাকার প্রয়োজন অপরিতৃপ্ত হ'বে। এক্ষেত্রে মায়েরও চিকিৎসার প্রয়োজন।

শিশুর মনোজগতে পিতার প্রভাব সম্বন্ধে সম্প্রতি নজর পড়েছে। যতদূর এ বিষয়ে জানা গেছে তা হচ্ছে এই যে, পিতার অনুপস্থিতি বা অসামঞ্জস চাপ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। বাবার চশমা নাকে বা জুতো পায়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ভাল-মন্দ সবদিকেই শিশুর একটা প্রবণতা থাকে 'বাবার মত হব'। অনেক গায়কের ছেলে গায়ক, চিকিৎসকের ছেলে চিকিৎসক, এমনকি মদ্যপের ছেলে মদ্যপ দেখা গেছে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনস্বীকার্য। আবার পিতার প্রতি সুপ্ত বিদ্বেষ পিতার

মত হওয়া থেকে ছেলেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় পিতা (মাতাও কখনও) অসফল সাধের রূপায়ণ করতে চান সন্তানের মধ্যে। এতে শিশুর উপর চাপ পড়ে। তার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সাধ্যের সঙ্গে যদি মিল হয় তো ভাল। আর তা না হ'লে ফল ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা। সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে তার দুই থেকে পাঁচ বৎসর বয়সে। পিতাকে শিশু চেনে মাকে চেনার অনেক পরে। সেই জন্য পিতার শূন্যস্থান পূরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। চরিত্রের নিয়মের দিক, প্রবৃত্তি দমনের দিক, ও দৃঢ়তার দিক পিতার কাছ থেকে আসে। আর তার স্নেহ, শিশুর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিজগতের যোগাযোগের বুনিয়াদ হয়। বয়স্ক ও পরিণত ভালবাসার গোড়া ওখানেই। অপিতৃক সন্তানের অন্তরক্ষুধা মানসিক অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করে। পিতৃহীন ছেলে নরম মেজাজের হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বাস্তব প্রয়োজনে কঠোর (নিষ্ঠুর নয়) হওয়া তার পক্ষে সহজ হয় না। কখনো সে বিপথগামী ও সমাজ-বিরোধী অথবা অত্যধিক কড়া ও রুক্ষ মেজাজের লোক হয়। এখানে ব্যাপারটা— আপন মানসিক দৈন্য ঢাকবার প্রচেষ্টা। মেয়েদের পক্ষে ক্ষতি হয় আরো। পুরুষকে ভালবাসা মুশকিল হয়ে পড়ে। হয় কম, নয় অত্যধিক পুরুষসঙ্গ আসক্তি অনেক সময় মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ হিসাবে দেখা যায়। অপিতৃক পরিবারে মা, পিতার ভূমিকা নিলে সাধারণে প্রশংসা করে নিশ্চয়ই ; কিন্তু তা আশা করা উচিত নয়। তা সুফলপ্রসূ নয়।

সর্বক্ষেত্রেই যে একটা কুফল ফলবে এ কথা অযৌক্তিক। আবার বলছি পরিবেশের প্রভাব প্রচন্ড। তাই দত্তক সন্তানদের মানসিক বিকাশ অসম হবেই এমন কথা ঠিক নয়। এবং ভারতীয় যৌথ পরিবারে পিতৃহীন শিশুর, সত্যিকার স্নেহ ও শীলনশীল কাকা, মামা, দাদুর উপস্থিতি সেই ঘাটতি অনেকাংশে পূরিয়ে দেয়। অবশ্য যৌথ পরিবারের সবটাই ভাল ফল দেয় না। পিতার নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় নস্যাৎ হয়ে যায় তার পিতার প্রশ্রয়ে। আমরা দেখেছি পিতামহ ও পিতামহী এবং মাতামহ ও মাতামহীরা একটু সীমাধিক্য সদয় ব্যবহার করেন। একথা মনে করা ঠিক নয় যে সবসময় সদয় ব্যবহার করা ছেলে মানুষ করার সর্বাপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্প। বেতের ব্যবহার নিশ্চয়ই অপ্রশংসনীয়, তার আস্ফালনটা নয়। তবে তারও একটি সীমা আছে ; যে পিতার মানসিক পূর্তি যত উঁচু ধাপের, তিনি আপনিই বুঝতে পারবেন সীমারেখাটা কোথায়।

সেইজন্য যেমন বাবা-মা, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা তেমন হবে, এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। তবে আরও একটা নিয়ম আছে ঃ জীববিজ্ঞানের যেকোন ক্ষেত্রেই প্রতিটি গুণের তার গড়ের দিকে ঝোঁক থাকে। খুব লম্বা বাবা-মার ছেলেমেয়েরা লম্বা হয় ঠিকই তবে তাদের সমান সমান নয়। খর্বকায় লোকের ছেলে খর্বকায়। তবে ততটা নয়। অর্থাৎ এই দু'পক্ষেরই সন্তানদের মাঝারির দিকে একটা প্রবণতা থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়ম এতে রক্ষা হয়। তাই অস্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের পিতা-মাতার সন্তানও স্বাস্থ্যবান হয়। এবং অত্যন্ত মেধাবী পিতামাতার সন্তান অল্পমেধাবী হয়—তা এই কেন্দ্র-অভিমুখী টানের জোরেই। যাক্, সেটা বিষয়ান্তরের কথা ও বহু প্রাসঙ্গিক ব্যাপার।*

তবুও অনেক পিতা-মাতা প্রশ্ন করেন সন্তানরা মনের মত হয়নি। আসলে প্রশ্নটা হওয়া উচিত—সন্তানরা কি তাদের মত হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে, অনেকটা হয়েছে। এবং তাই হওয়া উচিত। তাই হয়। ওটাই জৈব জগতের নিয়ম। যেটুকু ব্যতিক্রম তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যখানে। পিতামাতার পরস্পরের ও তাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, তার চরিত্রে প্রতিফলিত হ'তে বাধ্য। একটা সাবলীল ও সুষ্ঠু সম্বন্ধের উপর গড়ে ওঠে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সুন্দর লক্ষণগুলো। প্রক্ষোভ জগতের ভারসাম্যটা গড়ে তুলে নেওয়াই কথা, বোধি তার যাই থাক্। বোধির বিকাশ ও বিস্তার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হলেও অনেকটা পৃথক। পিতামাতার প্রক্ষোভ সাম্য শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান। সন্তান থেকে পরোক্ষ শিক্ষালাভ হয় বাপ-মায়ের।

স্তন্যপায়ী জীবের অসীম মমতা সন্তানের উপর। এই মমতাই ঈর্ষাতে রূপান্তরিত অপরের প্রতি। সন্তানরক্ষণে সে প্রায়ই অবুঝ, কারণ প্রবৃত্তির দেওয়া হাতিয়ার তার হাতে। সন্তান-স্নেহ অনেকে বলে অন্ধ। বুদ্ধিজীবী স্তন্যপায়ী জীব মানুষের তাই বড় জ্বালা এই সমস্যায়। প্রক্ষোভগুলোর সংহত প্রয়োগের প্রচেষ্টা বুদ্ধিনিষ্ঠ মানুষের মস্ত বড় একটা অনুশীলনের ক্ষেত্র। অবদমনের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। তবে তার আগে জানালা-দরজাগুলো খুলে দেওয়া হোক্। একটু আলো-বাতাস আসুক। কিছু বৃষ্টির ছিটেও বুঝি আসতে পারে। কিন্তু ওতে সর্দি হয় না। সর্দি ঠেকাবার ক্ষমতা জন্মে। দয়ালু হ'তে বল্‌ছি না আমি। দয়াটা ভাল নয়। দয়ালু অপরে হয়। বাপ-মা হয় না। হওয়া উচিত নয়। পিতামাতার বিকল্প কি সত্যিই আছে?

যে সব বই এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। কেনেথ সোডি : ক্লিনিক্যাল চাইল্ড সাইকিয়াট্রি, বেলারি, টিনডাল ও কক্স, লণ্ডন ১৯৬০।
২। যোসেফ অল্টম্যান : অরগ্যানিক ফাউণ্ডেশন অব অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার, হোল্ট, রাইনহার্ট ও উইনস্টন, নিউইয়র্ক ১৯৬৬।

* দ্রষ্টব্য : বুদ্ধিমাপার গল্প।

৩ কথা শেখার কথা ও সমস্যা

ও তখন একটুকু। মা বলে, ও ও। মায়ের হাতে চুড়ি বাজে। টুঙ্‌টাঙ্‌ চামচ নড়ে। বিড়াল ডাকে মিউ।—এই সব শব্দ। তারপর আয়, খা, বাবা, মা—এই সব কথা। কিংবা আয় চাঁদ আয়, টিপ দিয়ে যা; খোকন সোনা হাসে, মাকে ভালবাসে—এই সব ভাষা। এইভাবে শুরু। এর মধ্যে শিশুরা বড় হয়। শোনে। শব্দ শোনে, কথা শোনে, ভাষা শোনে। বোঝে, কি, বোঝে না। শোনে আর এদিক সেদিক তাকায়। চোখ ঘুরিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে দেখে এ সবের উৎস কি? দেখায় শোনায় যোগ হয়। দু অনুভবের মিলন ঘটে। দেখে শুনে, শুনে-দেখে বুঝতে শেখে। কিসের কি মানে। দেখতে শেখে, শুনতে শেখে, বুঝতে শেখে। শেখায় শেখায় মেলামেশি। শিখতে শিখতে বলা শুরু।

কথা শেখা

ক'মাস তো ছিল শুধু কান্না-হাসি। তারপর মুখ দিয়ে, গলা দিয়ে কত
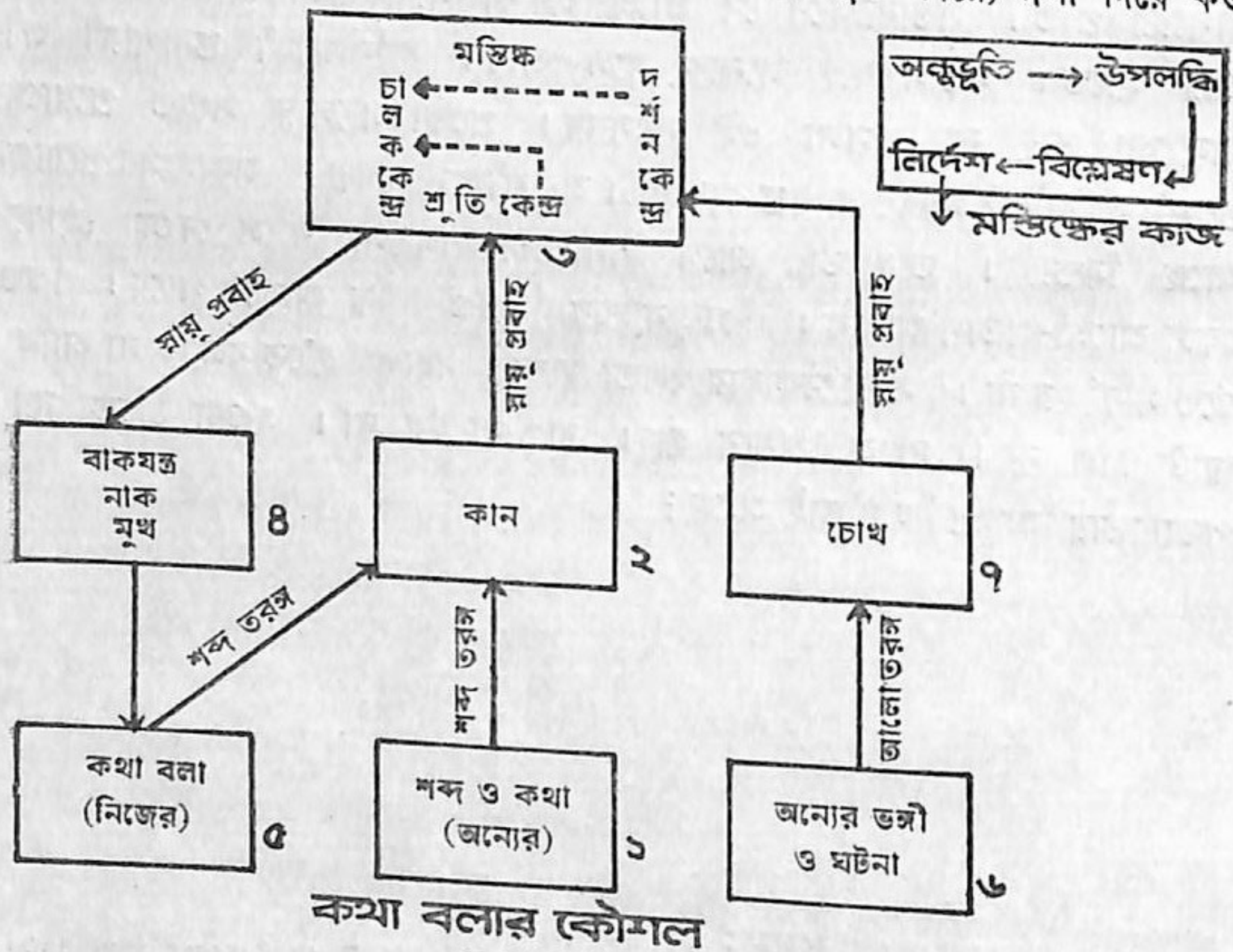
কথা বলার কৌশল

ছবি ৩.১

কি যে আওয়াজ। আবোল-তাবোল শব্দ। কোন মানে হয় না—তবু বলে। বারে বারে বলে। ঠোঁট দিয়ে, লালা দিয়ে গোল্লা বানায়। শব্দ হয়, খেলা

	শ্রুতি নেই	শ্রুতির পাল্লা	হিস হয়ে মিলিয়ে যায়
কম্পন	২০ নীচে	২০—২০,০০০	২০,০০০—৩০,০০০→
দৈর্ঘ্য	১৭ মিটারের বড়	১৭ মি. থেকে ১৭ মিলিমি.	১৭ থেকে ১২ মিলিমি. ছোট

কম্পনাঙ্ক, বাতাসের শব্দতরঙ্গ ও মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা

পুরুষ কণ্ঠ	১০০ কম্পন
নারী কণ্ঠ	১৫০ কম্পন

স্বরতন্ত্রীর নিম্নতম কম্পনাঙ্ক

শব্দের ধর্ম / গুণ	শ্রুতি-সংবেদনা
কম্পনাঙ্ক	তীক্ষ্ণতা
সম্প্রসারণ	উচ্চতা বা জোর
মিশ্রণ	মধুরতা

শব্দ থেকে সংবেদনা

বাতাসে	১২০০ কি.মি. ঘণ্টায়
জলে	৫০০০ ,, ,,
ধাতুতে	১,৬০০০ ,, ,,

শব্দের গতি

৩.২ : শব্দ ও মানুষের শ্রবণ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য : সূত্র :—টি-এস. লিটলার, ফিজিক্যাল সায়েন্স, ৮ম অধ্যায় : শব্দ, ওড়হ্যাম প্রেস লিমিটেড, লণ্ডন ১৯৬২।

হয়। হাসি-কান্না ছাড়া প্রথম প্রথম এই তার ভাষা। সবাই বোঝে না। মায়েরা বোঝে। বছর ঘুরলে কথা। শব্দ দিয়ে, ইঙ্গিত দিয়ে শুরু। বাগ্ময়তায় উত্তরণ। ব্যাপারখানা—দেখার মত। শেখার মত। বোঝার মত। এই খানেতেই শেষ নয়। সবাক শিশু অবাক করে। সে নিজের কথা শোনে। তার বলায় শোনায় যোগ হয়। আর এতে ভারী মজা পায়। এক কথা সে আবার বলে। সে অন্যের কথা শোনে। সেই মত সে বলতে চায়। শোনায় বলায় যোগ হয়। নিজের বলার ভুল থাকলে শুধরে নেয়। অন্যের বলার ভুল থাকলে শুধরে দেয়। তার কথায় বাড়ীর কথার আদল আসে। বাড়ীর ভাষা তার ভাষা দেয়।

এইভাবে সে শিখতে শিখতে বড় হয়। লেখাপড়া শুরু হয়। পড়াশুনা করে। এখানে-ওখানে যায়। স্কুলে যায়। কত কি দেখে। কত কি শোনে। কত
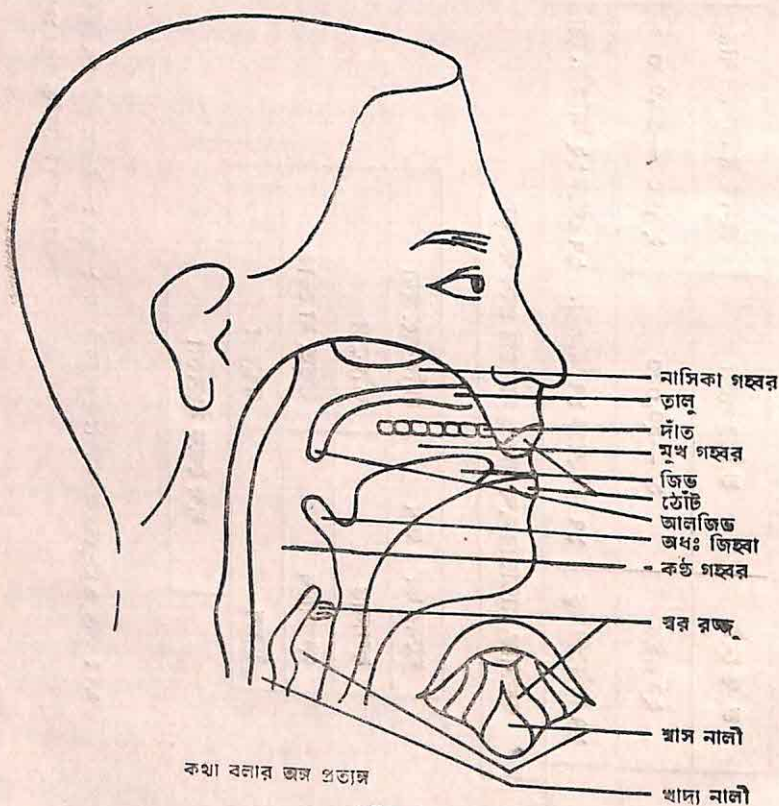
কথা বলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

ছবি ৩.৩

জিনিসের নাম শেখে। তাদের কাজ বোঝে। লোকের সংগে মেশে। কথা বলে। কথা শোনে। নিজের কথা। অন্যের কথা। কাজের কথা। গল্পের কথা। দিনে

দিনে কত শব্দের দুয়ার খুলে যায়। কত সংকেত। কত ব্যঞ্জনা। তার কথার পুঁজি বাড়ে। ভাষায় দখল আসে। নিজের নিজের ভঙ্গী হয়।

কিন্তু যে শিশুর শোনার ক্ষমতা নেই—তার কি হয়? তার জগতে শব্দ নেই। শব্দের সংকেত নেই। নেই তার মানে। শব্দ তাকে টানে না। তার মধ্যে জাগায় না কোন ঢেউ। সে কথা শোনে না। শেখে না। বলে না। শেখার প্রথম শর্তই যে শোনা। জিনিসের নাম, কাজের নাম বা অনুভবের নাম—সবই তার কাছে অজানা। শব্দে ভরা এ ভুবন। নামে ভরা এ ধরা। সভ্যতার বেশীটাই যে ভাষানির্ভর। মিশতে গেলে ভাষা চাই। পড়তে গেলে ভাষা চাই। মানুষের ইতিহাস, তার জ্ঞানের পুঁজি আর চিন্তার ইতিবৃত্ত—বেশীর ভাগই যে কথায় গাঁথা। এ জগতের অনেকটাই তার কাছে অজানা থেকে যায়। পৃথিবীটা যেন তার কাছে নির্বাক চলচ্চিত্রের মত। সোঁ, সোঁ বাতাস বয়। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ে। ঘেউ ঘেউ কুকুর ডাকে। কিড়িং কিড়িং —সাইকেল—সে কি জানে?

অ-বাক শিশু

সে মাকে দেখছে। মার কোলে বড় হচ্ছে। কিন্তু জানে না মা নামে কি বোঝায়। মা নামে কি জাদু আছে। মায়ের আদরের কথাগুলি সে জানতেই পারে না কত মিষ্টি। আর ভালবাসি—এ কথার মানে সে সম্পূর্ণ করে কোনদিন বুঝতে পারবে না। আর তার চেয়ে বড় বেদনা—বোঝাতেও পারবে না। অথচ কি পরিতাপ—ওদের কথা বলার অঙ্গ ছিল অটুট। ছিল কথা বলার ক্ষমতা। কিন্তু তার প্রকাশ হল

যে কানে শোনে না, সে কথা বলে না
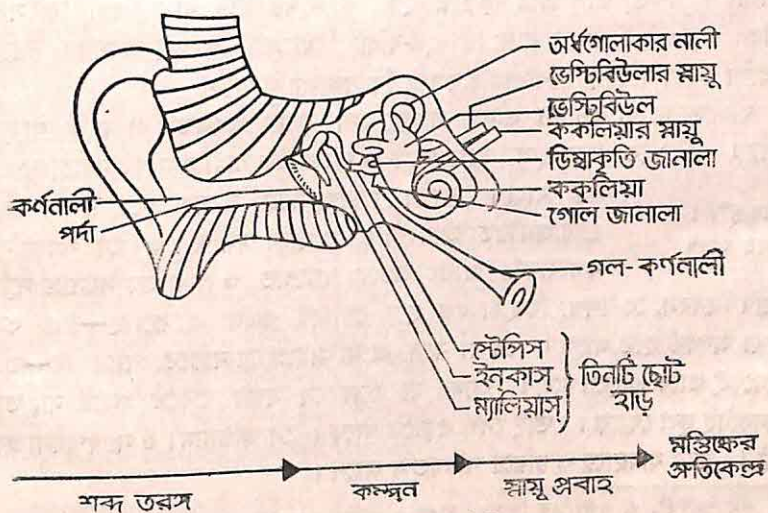
ছবি ৩.৪: মানুষের কানের বিভিন্ন অংশ

না। কথা সে শুনতে পেল না বলেই কথা বলল না। তাই যারা কানে শোনে না তারা নির্বাক। ভাষা তার শব্দহীন। শুধু ইঙ্গিত, শুধু ইশারা। জীবনের অনেক সুবিধা ও আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের চোখে অন্য মানুষরাও নির্বাক। প্রথমে তারা ভেবে অবাক হয় মানুষ খাওয়া ছাড়া মুখ নাড়ে কেন? পরে যখন সে জানে, ওরা পরস্পরের সঙ্গে 'কিছু একটা' দেওয়া-নেওয়া করে—তার স্বরূপ ওর কাছে স্পষ্ট নয়—সে কেমন দিশেহারা সন্দিহান হয়ে পড়ে। বধিরদের সন্দিগ্ধমনা বলে একটা ধারণা আছে একারণেই।

বধিররা কি সবাক হতে পারে না? সে কি চিরকাল নির্বাক থেকে যাবে? নির্বাক পশুদের চোখের জল নিয়ে অনেক গল্প আছে। নির্বাক শিশুদের গল্প কই? আছে শুধু মূক এই শিশুদের ম্লান পিতামাতা ও সামাজিক মূঢ়তা। প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য গুটিকয় 'মূক-বধির বিদ্যালয়।' মূক-বধির তো মূক হবার জন্য জন্মায় না। বধির হয়ে জন্মায়। মূক তার ফলশ্রুতি মাত্র। বধিরতা অতিক্রম করলে মূক মুখেও ভাষা ফুটবে। সে মুখর হবে।

মূক-বধির সমস্যা কত বড়

১৯৮১ সালের আদমসুমারী বলছে যে, দেশে ২,৭৬,৬১১ জন মূক-বধির আছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০,০০০। কলকাতায় ২,০০০। এর পাঁচ ভাগের দু ভাগ শিশু।* এই শহরে ৮০০ জন বধির শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার মত আয়োজন আছে কি? কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়গুলির ছাত্র নেবার ক্ষমতার বহুগুণ বড় এই সংখ্যা। কলকাতার মত বড় শহরে যদি এই অবস্থা হয়, গ্রাম-গঞ্জের কথা ভাবলে বুক শুকিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের ৮,০০০ শিশু এবং ভারতের ১,১০,০০০ শিশুর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা কোথায়? কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন মূক কি মুখর হবে না? ওরা কি সারা জীবন মূক-বধির থেকে যাবে? মূক-বধির বিদ্যালয় কি এই সমস্যার উত্তর? বধিররা কতটা বধির? শোনার অক্ষমতা কি সকলের সমান?

কথার খুঁত : অন্যান্য কারণ

বধিরতা ছাড়া, অন্যান্য নানা কারণে কথা বলার অক্ষমতা বা ত্রুটি থাকতে পারে। এই খুঁত পড়াশুনা করার পক্ষে ও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রার পক্ষে মস্ত বাধা। কারণ পড়াশুনাতে সুন্দর করে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কথাবার্তার অভাব অনেক ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, যে শিশু কিছুটা বড় হয়ে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে—তার কথা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে থাকে। সে যা বলে অন্যে সহজে তা বুঝতে পারে না—তাই অনেকেই তাকে এড়িয়ে চলে। অন্যে যা বলে সে সবটা বুঝতে পারে না, তাই অনেকটাই ভুল বোঝে। তাই সেও এড়াতে থাকে। সে অভিমানী ও সন্দিগ্ধমনা হয়ে ওঠে। তার ব্যবহারে ও চরিত্রে পরিবর্তন আসে।

---

* বিজন চক্রবর্তী, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সংখ্যা : নিখিল ভারত সাধারণ চিকিৎসক সমিতি, ১৯৭৯।

মৃদু বাতাসে পাতার কাঁপন	১০ ডেসিবেল
ফিস ফিস কথা	৩০ ,,
সাধারণ গলা	৬০ ,,
উঁচু গলা	৬৬ ,,
খুব উঁচু গলা	৭২ ,,
চীৎকার	৭৮ ,,
কোলাহল (যান্ত্রিক)	৯০ ,,
নিশ্চিত ক্ষতিকর	১৩০ ,,

শব্দের জোর ও কানে শোনার ক্ষমতা
এক মিটার দূর থেকে

ধর্তব্য নয়	২৫ ডেসিবেলের নীচে
যৎসামান্য	৪০ এর নীচে ২৫ পর্যন্ত
সামান্য	৫৫ এর নীচে ৪০ পর্যন্ত
মাঝারি	৭০ এর নীচে ৫৫ পর্যন্ত
বেশী	৯০ এর নীচে ৭০ পর্যন্ত
খুব বেশী	৯০ এবং উপরে

শ্রুতি—প্রতিবন্ধকতা
৫০০, ১০০০ ও ২০০০ কম্পনাঙ্কের হিসাবে

বধিরতা—
- —পরিবাহী
- —সংবেদন স্নায়বিক
- —কেন্দ্রীয়

৩,৫ : মানুষের শ্রবণ ও শ্রবণ-হ্রাস সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য : সূত্র : উইলিয়াম বার্নস, নয়েজ অ্যাণ্ড ম্যান, জন মারে, লণ্ডন ১৯৬৮।

সুন্দর কথা বলার পক্ষে আবশ্যক হল ঃ কথা বলার সুস্থ ও স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, শোনার ক্ষমতা, বুদ্ধি ও মানসিক সুস্থতা। সব কিছু শেখার জন্য চাই বুদ্ধি। কথা শেখা বেশ জটিল ব্যাপার। এটা সব চেয়ে বোঝা যায় তখন, যখন একটা শিশু স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখে না। কথা শেখার জন্যও বুদ্ধি
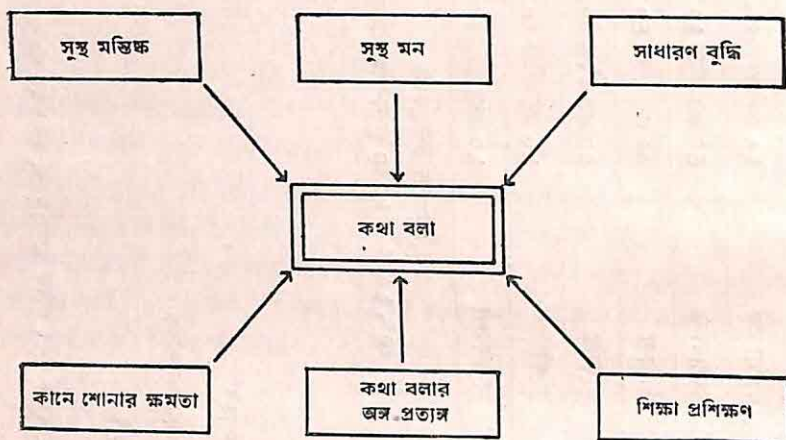
কথা বলার জন্য কি কি দরকার

ছবি ৩.৬

চাই। স্বাভাবিক গড়পড়তা বুদ্ধি চাই। বুদ্ধির ঘাটতি থাকলে—কানে শোনার ক্ষমতা ঠিক থাকলেও—কথা শিখতে দেরী হবে। কথার অনেক দোষ থাকবে। মানস-মন্দনের সঙ্গে বাক্-ত্রুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধু মানসিক ক্ষমতাটুকু নয়, মাথার যেন কোন রোগ না থাকে—মৃগী, সেরিব্রাল পলসি ও সন্ন্যাস। মস্তিষ্কের প্রদাহ হয় এমন যে কোন অসুখের ফলে কথার খুঁত সৃষ্টি হতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তপাত বা রক্ত জমে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে ডান দিকের অঙ্গ পড়ে গেলে, তার সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতাও চলে যায়। এসব লোকের মস্তিষ্কের বাম দিকে ব্রোকাস-অঞ্চল—যা বাক্-কেন্দ্র বলে বলা হয়—তা অবস্থিত। আবার, যে সব ভেষজে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে, তাদের ব্যবহার কথা ও ভাষার উপর প্রতিফলিত হবে।

কথা বলতে বলতে আটকে যাওয়া আজকের পড়ুয়াদের মধ্যে অতি সাধারণ ঘটনা। এই সব ছেলেমেয়ের বন্ধুরা তাদের ক্ষেপায়, ভেঙচি কাটে এবং আরও নানা-ভাবে জ্বালাতন করে। অচেনা অবন্ধুরাও কেউ কেউ রাগায়, অনুকম্পা করে বা এড়িয়ে যায়। যারা অনুকরণ করে, ভেঙচি কাটে, তাঁরা জানে না যে এর ফলে তাদেরও কেউ কেউ তোতলা হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, এই সব জ্বালাতনের ভয়ে বা নিজের খুঁত ঢাকতে, সে কথা বলতে ভয় ও

তোতলামি

লজ্জা পায়। ফলে তারা ভীতু, মুখচোরা বা রাগী হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে তার সামাজিক জীবনে আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং সে অসুখী বোধ করে।*

বয়ঃসন্ধিকালে গলার স্বর বদলাবে এটা স্বাভাবিক। কারো কারো বেলায় তা হয় না। ছেলের গলা মেয়ের মত আর মেয়ের গলা ছেলের মত শোনালে অপরের কৌতুক জাগে। এরকম কণ্ঠের মালিক কথা বলতে কিন্তু লজ্জা পায় ও কথা বলা এড়িয়ে চলে। ক্রমে একটা হীনতাবোধ তাদের মধ্যে আসে। এতে তার ব্যক্তিত্বের বেশ ক্ষতি হয়।

এছাড়া থাকে নানারকম চাপা মানসিক কারণ। বাড়ী ও পরিবেশের কারণে কোন কোন শিশু কথা বলতে দেরী করে। আবার দেখা যায়, কোন মানসিক সংকটে, কিছু তরুণী বা বধূর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। শারীরিক অসুখ-বিসুখের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। মানসিক ব্যাধিতেও দেখা যায়—কথা ও ভাষার নানা পরিবর্তন। বিষাদ রোগে—কথা কম, উল্লাসে—বৃদ্ধি, উম্মত্ততায়—ছড়া, কবিতা, গান ও আক্রমণাত্মক কথাবার্তা। খণ্ডিত মানসে—অর্থহীন, অসংলগ্ন, কখনও বা দুর্বোধ্য শব্দসমষ্টি। মানস-মন্দন ছাড়াও, 'অটিজমে' ভুগলে শিশুরা কথা বলে না। আর বললেও অটিস্টিক শিশুর কথা অনুপযুক্ত, অপর্যাপ্ত, অসংলগ্ন ও যান্ত্রিক।

সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ণতার জন্যে কথার খুঁত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এগুলি হল—মুখ ও গলার ভেতর গঠন বিকৃতি বা ক্ষত, টাগরায় ফুটো, মাড়ি ও ঠোঁটে ফাঁক, আটকান জিব, অসমান দাঁত আর গলার ঘা বা অস্ত্রোপচার। গলার কর্কট রোগে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, অস্ত্রোপচার করতে হয়। কিন্তু রোগী কন্ঠস্বর হারিয়ে ফেলে।

দেখা যাচ্ছে, কথা-না-বলা বা কথা বলার খুঁতের কারণ একাধিক। তাই সকলের জন্য এক পরামর্শ নয়। সবার আগে জানা চাই সঠিক ব্যাপারটা কি? প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা, প্রয়োজন চিকিৎসা—ওষুধ, শল্য-ব্যবস্থা যেখানে যেমন লাগে। তাছাড়া আছে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ, বাক্‌চিকিৎসা ও ব্যায়াম। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ বা বিভাগীয় পরামর্শ প্রয়োজন তা হল: ১। কান-নাক-গলা (Ear, Nose & Throat—ENT), ২। বাক্-শ্রুতি (Speech & Hearing) ৩। মনস্তত্ত্ব ও মনোরোগ (Psychology and Psychiatry), ৪। স্নায়ুতত্ত্ব (Neurology), ৫। গঠন-মূলক শল্যবিদ্যা ও দন্তগঠন বিদ্যা (Plastic Surgery & Orthodontic Surgery), ৬। ভৌত চিকিৎসা (Physical Medicine), ৭। যোগ ৮। ব্যায়াম।

কি করা যায়

আন্তর্বিভাগীয় প্রচেষ্টা

* এ বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ আছে।

এরপর আসে বিশেষ শিক্ষার কথা। কথা-বলার ত্রুটিযুক্ত শিশুকে যথাযথ পরীক্ষা ও আবশ্যক চিকিৎসা করার পর বা সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে আনতে হয়। এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে ঃ

বিশেষ শিক্ষা

১। সাধারণ জিনিস চেনা ও তাদের নাম শেখা। নিজের শরীরের অংশ, জামাকাপড়, খাবার-দাবার ও নিকট-আত্মীয়দের নাম ও সম্পর্ক।

২। বধিরদের শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে শোনা অভ্যাস করা। নানারকম সাধারণ আওয়াজ ও জীবজন্তুর কন্ঠস্বর। মানুষের কণ্ঠ ও কথা। বাড়ীর লোকের কথা ও নিজের কথা। কথা শেখানো। ঘরের এবং নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্রের নাম শোনানো ও বলানো।

৩। পরিবেশ পরিচয়। চারপাশের সব কিছু—মানুষজন, পশুপাখি, গাছপালা, নদীপাহাড়, আকাশসমুদ্র। তাদের নাম—কাজ, আরও অনেক কথা। তার সঙ্গে বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, গাড়ী ও যন্ত্রসভ্যতার সামগ্রী।

৪। ভাষা শেখানো ঃ বিশেষ্য হয়ে গেলে—ক্রিয়া, বিশেষণ ও সর্বনাম—সরল বাক্য, যৌগিক ও সবশেষে সম্ভব হলে অব্যয় ও জটিল বাক্য ব্যবহার শেখানো। সবই হবে স্বাভাবিক ছন্দে—শিশুটির ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী।

৫। খেলাধুলা, নাচগান, ছবি আঁকা, সেলাই ইত্যাদি দ্বারা শিশুদের আনন্দে রাখা, তাদের সৃজনশীলতাকে জাগানো ও দৈহিক কুশলতা তৈরি করা।

৬। লিখতে, পড়তে ও অঙ্ক করতে সাহায্য করা।

৭। বাড়ীতে কি ভাবে কি করতে হবে—সে সম্পর্কে অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া।

এইভাবে শিশুকে সাধারণ জীবনের জন্য, সাধারণ বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি করা হয়। কোন কোন শিশু এখান থেকে গিয়ে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কারো ক্ষেত্রে এটা থাকে পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে। আবার কেউ হয়ত কোন দিনই সাধারণ বিদ্যালয়ে যেতে পারবে না। তাকে যতটা সম্ভব এখানেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া খেলা, নাচ, গান, ছবি আঁকা ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা থাকে।

সমন্বয়ীকরণ

এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানারকম বিশেষ সরঞ্জাম, আয়োজন ও বড় জায়গা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও অন্ততঃ এই ধরনের শিশুদের পরিচালনা করার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হওয়া উচিত ১ ঃ ৫ থেকে ১ ঃ ১০। স্বভাবতঃই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় খরচ বেশী। তাই যতটুকু না হলে নয়—ততটুকুই থাকবে। এখান থেকে সাধারণ

শিক্ষালয়ে যে সব শিশু যাবে তাদের প্রথম প্রথম মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা হতে পারে। সেগুলোর সমাধান করবে এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলি—তার সঙ্গে যুক্ত মনোবিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীরা। এই দুই শিক্ষালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও অভিভাবকগণের সহযোগিতা দরকার। সমন্বয়বাদীরা মনে করেন—সঠিক বিকাশের জন্য শিশুকে তার সামগ্রিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। প্রতিবন্ধী বলে তাকে বরাবরের মত চিহ্নিত করে আলাদা করে দেওয়া উচিত নয়। সে সাধারণ বিদ্যালয়ে যাবে, অন্যদের সঙ্গে পড়াশুনা করবে, খেলবে, মিশবে ও কাজ করবে। এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠবে। এতে পারস্পরিক সহনশীলতা গড়ে ওঠে। তাই শৈশব জীবন থেকেই—পরবর্তী বৃহত্তর জীবনে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার মত শিক্ষা নেবে সে। আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? বাল্যের উপহাস, টিকার মত রক্ষাকবচ হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেবে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপেক্ষার বিরুদ্ধে। সে শিখবে—কিভাবে পরিহাস করতে হয় সামাজিক মূঢ়তাকে, আর কিভাবেই বা জীবনকে যোগ করতে হয় জীবনের সঙ্গে।

---

৪ | তোতলামি

ভূমিকা

তোতলামির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তোতলামি কি ও কেন বুঝবার আগে "কথা" কি—তা জানা দরকার। কথা হল মানুষের উচ্চারিত অর্থপূর্ণ শব্দ এবং প্রধানতম যোগাযোগ-মাধ্যম। প্রকৃতিতে সৃষ্ট সব অর্থপূর্ণ শব্দ অবশ্য কথা নয়—যেমন ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ। আবার গলা খাঁকারি, কাশি ইত্যাদি মানুষের গলার হলেও তা কথা নয়। কথার জন্ম মানুষের মস্তিষ্কে —প্রকাশ কণ্ঠে। কথার পর কথা সাজিয়ে ভাষা। কথা ও ভাষা বক্তার বয়স, মানসিকতা, চরিত্র, শিক্ষা, কৃষ্টি ও আঞ্চলিকতা প্রতিফলিত করে। কথার পরিমাণ ও গুণগত পার্থক্য ঘটে সভ্যতা ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সুতরাং বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কের উপর তা নির্ভরশীল।

মানবশিশু সাধারণতঃ এক বছর বয়সে কথা বলতে শুরু করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া এত স্বতঃস্ফূর্ত যে, এর মধ্যে যে জটিল স্নায়বিক-মানসিক-সামাজিক কলাকৌশল কাজ করে সে সম্বন্ধে আমরা কদাচিৎ সচেতন হই। বয়স, শিক্ষা তথা পরিবেশের প্রভাবে শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ও ভাষার গঠন বহুলাংশে বদলে যায়। তথাপি আমরা যখন কাউকে কথা বলতে শুনি তখন প্রধানতঃ আমরা তার মধ্য থেকে বক্তব্যটুকু গ্রহণ করি। মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, অন্যমনস্কতা ও শারীরিক অসুখ-বিসুখে প্রত্যেক মানুষেরই কথায় কিছু না কিছু পরিবর্তন বা বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু কয়েকটি অসুখের ক্ষেত্রে ছাড়া, এই বিচ্যুতি বেশীর ভাগই অস্থায়ী বা তাৎক্ষণিক। বক্তা বা শ্রোতা কেউই এদিকে তেমন মন দেয় না। কিন্তু কোন ত্রুটি যখন বার বার বা দীর্ঘ সময় ধরে ঘটতে থাকে তখন শ্রোতার মন বক্তব্যের চেয়ে বলার ভঙ্গীর দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়। বক্তাও সচেতন হয়ে পড়ে। সে কথা ও স্বরের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যতই সে শোধরাবার চেষ্টা করে, কথায় কথায় হোঁচট খায় এবং তার ভাষার গতি ব্যাহত হয়ে পড়ে। তখন আমরা সেই ব্যাপারটাকে তোতলামি বলি।

বৈশিষ্ট্য

১. তোতলামি নৈর্ব্যক্তিক নয়। কথা বলতে গেলে অন্ততঃ দুজন চাই। এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে গেলে তোতলামি আসে। যেখানে শ্রোতা নেই, সেখানে তোতলামি নেই। তোতলাদের শতকরা ৬০ জন পড়ার সময় তোতলামি

করে না। একা একা পড়া, আবৃত্তি ও গান গাওয়ার সময় তাদের অধিকাংশই তোতলামি-মুক্ত—আর সবার মত স্বাভাবিক।

২. **শ্রোতার ব্যক্তিত্ব ঃ** শ্রোতার বয়স, শিক্ষা, পোশাক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বক্তার তোতলামি নির্ভর করে। বেশীর ভাগ তোতলা সমবয়সী ও ছোটদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে। কিন্তু গুরুজন, শিক্ষক, বয়স্ক ও অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তোতলামি শুরু করে।

৩. **স্থান ঃ** তোতলামি শুধু পাত্র-ভেদে নয়—স্থান-ভেদেও সম্ভব। ছেলে বাড়ীতে ঠিক—বিদ্যালয়ে গেলেই তোতলা হয়ে যায়। আবার খেলার মাঠে চমৎকার কথা বলে—বাড়ীতে ঢুকেই তোতলা।

৪. **বাড়ীর পরিবেশ ঃ** কঠোর শৃঙ্খলা-পরায়ণ, সদা-সমালোচক, ধৈর্যহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা-মা, অকারণ বা অতিরিক্ত শাসন-সোহাগ, ছেলেমেয়েদের অসম প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া, তুলনা করা, বাকপটুতা অর্জনের দিকে বেশী নজর দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা তোতলাদের বাড়ীতে বেশী লক্ষ্য করা যায়। আত্মীয় বা অন্য কেউ, বিশেষ করে বাবা-মা, দাদা-দিদি তোতলা থাকলে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তোতলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অন্যের অনুকরণ করে বা ব্যঙ্গ করতে গিয়ে অনেকে তোতলা হয়ে যায়। আবার, ছোট ভাই-বোনের জন্ম, রোগভোগ, অবহেলা, অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে পাঠান ইত্যাদি ঘটনার পর তোতলামি শুরু হতে দেখা গেছে।

৫. **ভাষার পরিবেশ ঃ** তোতলাদের ভাষা-পরিবেশ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—অতি অল্প বয়সে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলি ভাষার বোঝা। বাড়ীর ভাষা এক, বাইরের ভাষা আর এক। বিদ্যালয়ে শিখতে হচ্ছে হয়ত আরও একটা ভাষা। যদিও সরকারী নির্দেশ, শিশু ছ'বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যাবে, বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিবার শিশুকে তিন বছর বয়স থেকেই বিদ্যালয়ে পাঠান এবং অন্য একটি ভাষা শেখার উপর জোর দেন। মাতৃভাষা ছাড়া, আরও একটি-দুটি ভাষা শিশুর তিন থেকে ছয় বছরে চাপিয়ে দেওয়ায় তার মানসিক বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তি থেকে তোতলামি বিচিত্র নয়।

৬. **তোতলাদের বয়স ঃ** সব বয়সের তোতলা আমরা চারপাশে দেখতে পাই। তোতলাদের মধ্যে অল্পবয়সী বেশী, বয়স্ক কম। তোতলামি শুরু হয় ৫ বছর বয়সে শতকরা ৫০ জনের। বাকীরা শুরু করে ৬ থেকে ১৫-এর মধ্যে। ১৬ বৎসর বা তার পরে তোতলামি শুরু হয়েছে এমন ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। আবার মজার ব্যাপার এই যে, ২ থেকে ৫ বছরের ভেতর যারা তোতলামি শুরু করে, তাদের অধিকাংশ সেরে যায়। এমনি এমনি সেরে যাওয়ার সংখ্যা উপর দিকে কমতে থাকে। কিন্তু আবার আশার কথা যে, বয়স্ক জনসংখ্যার তুলনায় বয়স্ক তোতলার সংখ্যা কম, মাত্র শতকরা এক।

৭. **তোতলামির শুরু ঃ** শতকরা ৪০ জন তোতলামি শেখে—অনুকরণ করে।

বাকী ৬০ জন করে নানা কারণে। ভাষা শেখার প্রথম দিকে বাচ্চাদের কিছু দ্বিধা ও উচ্চারণে অস্পষ্টতা বা বিকৃতি থাকে। পরে সে সেগুলো কাটিয়ে ওঠে ও সঠিক ভাবে বলতে শেখে। আবার নতুন কথা বা বাক্য লিখতে গিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি হবেই। সহজ ও সহনশীল পরিবেশে শিশু নিজেই তা কাটিয়ে ওঠে। কথা ও বাক্য যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগ করতে শেখে। এই সময়ে অতি সূক্ষ্ম কারণে তার শিক্ষার গতি ব্যাহত হতে পারে। কথা বলতে গেলেই যদি প্রায় নিষেধ শুনতে হয়, শুনতে হয় সমালোচনা বা বিরূপ মন্তব্য—তা হলে তোতলা না হয়ে উপায় কি? কথা বলতে চাই—আবার কথা বললেই তাড়না—অতএব কথা বলব না—এই দুই বিপরীত মনোভাব একসঙ্গে কাজ করে। ফল তোতলামি। যেমন গাড়ীর বেশ গতি থাকতে থাকতে "ব্রেক" কষলে যা হয়। এরপর শুরু হয় পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। তোতলামি বেড়েই চলে। তাই দেখা গেছে, একটু চেষ্টা করলে পরিবেশের মধ্যে তোতলামির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।
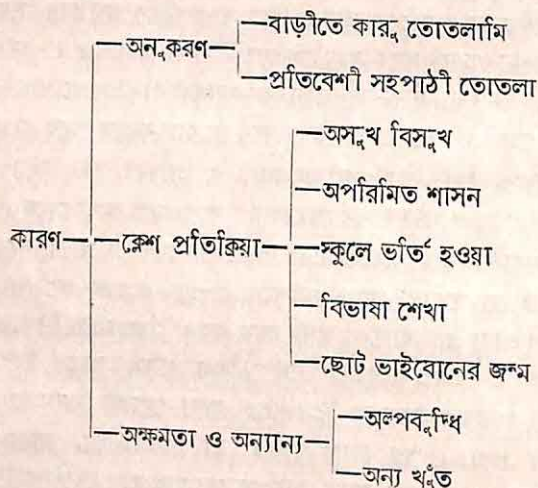
ছবি ৪.১ : তোতলামির কারণ।

৮. **তোতলামির মাত্রা :** তোতলামির আরম্ভে বা সাধারণ অবস্থায় যোগাযোগ ব্যাহত হয় না। দু'চারটে শব্দ বা কথা মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি হয়। বক্তা বা শ্রোতা কেউ সেদিকে তেমন মন দেয় না। পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি শব্দ বা শব্দাংশ দীর্ঘায়িত হতে থাকে ও মাঝে মাঝে কথা (কয়েক সেকেন্ডের জন্য) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে শ্রোতা ও বক্তা দুজনের মন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ছোটদের চাইতে বড়দের এটা বেশী হয়।

এর পরবর্তী পর্যায়টা গুরুতর। বক্তা তার বাক্-রোধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। ফলে হয় নানারকম প্রতিক্রিয়া। কারুর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। কারও চোখ পিট পিট করে। কেউ ভুরু নাচায়। কেউ বা মাথা ঝাঁকায়। কেউ হাতে হাত

ঘষে, মাথা চুলকায়, টেবিলে ঘুষি মারে বা পা ঠোকে। বস্তুতঃ এ সমস্ত অঙ্গভঙ্গী অন্যের হাসির উদ্রেক করে। তাতে বক্তা আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং যোগাযোগ কার্যতঃ বিনষ্ট হয়।

৯. **তোতলাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য ঃ** সাধারণ শিশুদের তুলনায়, তোতলাদের মধ্যে "বুদ্ধিতে খাটো"র সংখ্যা বেশী। তাই বলে সব তোতলা খাটো-বুদ্ধি নয়। তাদের কেউ কেউ অতি বুদ্ধিমান। তোতলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—তাদের উদ্বেগ-প্রবণতা—বিশেষ করে যাদের বয়স ১৫র উপর। সামান্য কারণে তারা বিব্রত ও বিপন্নবোধ করে। তাদের মধ্যে লাজুকদের সংখ্যা বেশী। তারা মুখচোরা বা অন্তর্মুখীন ধরনের লোক। তোতলামির ফলশ্রুতি হিসাবে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। তারা কথাবার্তা এড়িয়ে চলে, মেলামেশা করে না ও মনোকষ্টে থাকে। তার আত্মবিশ্বাস চলে যায়। সে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত, রাগী, একগুঁয়ে ও জেদী হয়ে পড়ে। কারও কারও অবস্থা প্রান্তিক মানসিক ব্যাধির কাছাকাছি।

১০. **বাক্-যন্ত্রের ত্রুটি ঃ** সাধারণের ধারণা আলজিভ ছোট থাকলে বা অন্য কোন খুঁত থাকলে তোতলা হয়। তা যদি হত—সে সর্বদাই তোতলাত। তোতলারা সর্বদা তোতলায় না। সুতরাং বাক্‌যন্ত্রের ত্রুটি একটা ভ্রান্ত ধারণা।

১১. **অন্য ত্রুটি ঃ** সম্ভব। তোতলামির সঙ্গে অন্য খুঁত মিশে থাকতে পারে। যেমন—জড়তা ও নাকিস্বর। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় কারণ—যেমন জিভ আটকানো কিনা, টাগরায় ফুটো আছে কিনা, বুদ্ধির অল্পতা, মস্তিষ্কের রোগ, শিক্ষার ত্রুটি বা অন্য কোন মানসিকতা কাজ করছে কিনা দেখতে হবে।

প্রতিকার

তোতলাদের সমালোচনা করে লাভ নেই। উপহাস করলে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়। আর পাঁচটা শিশুর মত তাকে আদরে গ্রহণ করতে হবে। তবেই সে সহজ হবে ও স্বাভাবিক আচরণ করবে। প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বয়স নির্বিশেষে তোতলাদের তোতলামি দূর হয়।

ভাষা শেখার সময় উৎসাহ দিতে হবে ও ধৈর্য ধরতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, সব শিশুর ভাষা শেখার পরিমাণ সমান নয়। আবার একই শিশুর বিভিন্ন বয়সে ভাষা শেখার গতি এক নয়। এইসব ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের ধৈর্যশীল হতে হবে। বিরূপ মন্তব্য, অধৈর্য ও হতাশা শিশুকে নিরুৎসাহিত করে। একসঙ্গে অনেকগুলো ভাষা শেখানর প্রবণতা ছাড়তে হবে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ-ছ' বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর কথার এই ত্রুটি নিয়ে কোন উদ্বেগ না দেখানোই ভাল। এদের বেশীর ভাগ সয়ে নিলে সেরে যায়। ঠাট্টা, বকুনি বা শাস্তি দেওয়া একেবারে অনুচিত। এতে সে আত্মসচেতন ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। ফল হয় অত্যন্ত অনভিপ্রেত। কথায় ও ব্যবহারে সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। এই চারিত্রিক পরিবর্তন খুব ক্ষতিকর। এতে তার ব্যক্তিত্ব বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

৪.২ : তোতলামি সারাতে কার কাছে যাবেন।

তোতলামির গুরুত্ব বুঝে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ দরকার। যোগাযোগ, পড়াশুনা ও কাজকর্ম কতটা বিঘ্নিত হচ্ছে, অনভিপ্রেত চারিত্রিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন কিছু আছে কিনা, এর স্থায়িত্ব কত দিনের, বাড়ীর অন্য শিশুর উপর এর প্রভাব পড়ছে কিনা—এসব বিবেচনা করতে হবে। তোতলামির "চিকিৎসা" প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পদ্ধতি। ওষুধপত্রে যেমন কাজ হয় না, তেমনি কাজ হয় না জড়ি-বুটি, তাবিজ-মাদুলীতে। মুখে কোন রকমের গুলি রাখা একেবারে উচিত নয়। ধাতুর বিষক্রিয়া আছে। তা ছাড়া পেটে চলে গেলে বিপদ ঘটবে।

তোতলামি একটা আন্তর্শাস্ত্রীয় বিষয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের কর্ণ-নাসিকা-কণ্ঠ, মনোবিজ্ঞান ও বাক্-শ্রুতি বিজ্ঞানের আওতায় এটা পড়ে। অতএব এই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা তোতলামি চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত। কলকাতায় তিনটি বড় হাসপাতালে বাক্-শ্রুতি কেন্দ্র খোলা হয়েছে ক-না-ক বিভাগের অধীনে। জনসাধারণ এখান থেকে বিনামূল্যে পরামর্শ নিতে পারেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আছে মহীশূরের বাক্-শ্রুতি শিক্ষায়তন। তোতলামি সারাতে মাতৃভাষার ব্যবহার বিধেয়। তাই প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় এই ধরনের কেন্দ্র প্রয়োজন।

মূলনীতি :

১। শিশুকে সহজভাবে কথা বলতে দিন।
২। তোতলাদের ব্যঙ্গ করা থেকে অন্য শিশুদের নিবৃত্ত করুন।
৩। পিতামাতা ও শিক্ষকদের মনোভাব ও আচরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনুন।
৪। বাড়ীর অন্যদের কথা ঠিক করুন।
৫। দরকার হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিন।

নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ছাড়া, দুটো বই-এর সাহায্য এই লেখায় নেওয়া হয়েছে। লেখক দুজন মনোবিজ্ঞানী—একজনের মাতৃভাষা হিন্দী, অন্যজনের কানাড়া। ইংরাজীতে লেখা বই দুটো হল :

১। স্ট্যামারিঙ্ : ডঃ এস. কে. কুলশ্রেষ্ঠ, মানস সেবা সংস্থান পাবলিকেশন, নাগরি প্রেস, দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ ১৯৬৮।
২। স্টাটারিঙ্ : ডঃ জে. ভরতরাজ, স্বয়ংসিদ্ধা প্রকাশন, পদ্মশ্রী, ৭২০, ১৬শ মেন রোড, সরস্বতীপুরম, মহীশূর—৫৭০০০৯, ১৯৭৮।

৫ | অল্পবুদ্ধি শিশু

পর্ব এক

পেছনের কথা

আলফ্রাদ বিনে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। ১৯০৫ সালে, তার আবিষ্কৃত বুদ্ধিমাপার পদ্ধতি—যা বিনে-সিমঁ পরীক্ষা নামে খ্যাত—সারা পৃথিবীতে আদৃত আদর্শ। এই পরীক্ষায় উদ্দেশ্য ছিল শিশুর মানসিক বিকাশের পরিমাণ নির্ধারণ করা। পরীক্ষাথীর সাফল্য থেকে বের করা হয় তার মানসিক বয়স। মানসিক বয়স ও শারীরিক বয়সের অনুপাতকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে বেরোয় বুদ্ধ্যঙ্ক। শারীরিক বয়স ১৬-র উপর হলেও তাকে ১৬ই ধরা হয়। পরবর্তী কালে এই পরীক্ষা নানা ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে নানা দেশে, নানা ভাষায়। বিভিন্ন কারণে ও প্রয়োজনে আরও অনেক বুদ্ধিমাপা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ভেক্স্লারের পরীক্ষা। এতে পরীক্ষাথীর প্রাপ্ত সংখ্যার ভিত্তিতে তার (শারীরিক) বয়স অনুযায়ী সরাসরি বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায়। আবার কোন পরীক্ষায় মানসিক বয়স বা বুদ্ধ্যঙ্ক কোনটাই পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বুদ্ধির একটা স্তরগত ধারণা। যেমন বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী র‍্যাভেনের "প্রোগ্রেসিভ্ ম্যাট্রিসেস্" পরীক্ষা। সাধারণ অবস্থায় এই বুদ্ধ্যঙ্ক বা স্তর একটা ধ্রুবক। শিশুর বয়সের সংগে সংগে বুদ্ধি বাড়লেও এর বদল হয় না। অতএব শিশুর বয়স যাই হোক না, এই অঙ্ক বা সূচক থেকে বোঝা যায় সে কতটা বুদ্ধি ধরে বা সে বুদ্ধিতে খাটো কিনা এবং কতটা খাটো।

কেমন করে বুঝবো

মানসিক ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড প্রয়োজনীয় শক্তি তা স্পষ্ট বোঝা যায় মানসিক প্রতিবন্ধীদের দেখলে। চোখ, কান, হাত-পা থাকা সত্ত্বেও তারা কত অক্ষম আর কত অসহায়! মনোযোগ, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি এইসব হল মানসিক ক্ষমতা। এই সব শিশুর বুদ্ধি কম। তাদের সবকিছু শিখতে দেরী হয়। বসা, চলা, কথাবলা, পড়াশুনা, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সব ব্যাপারে তারা পিছিয়ে পড়ে। সাধারণ বুদ্ধির সমবয়সীদের চাইতে তারা প্রত্যেক বিষয়ে কম জানে ও কম কাজ পারে। অথবা কোন একটা কাজ সুন্দরভাবে করে পারে না। তাদের স্বাধীন চলাফেরা ও সাধারণ জীবনযাপন সম্ভব হয় না। সারা জীবন অন্যের তত্ত্বাবধানে কাটাতে হয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ ও তার নীচে। এর মানে এই নয় যে ৭০ আর ৭২-এ খুব

বেশী তফাৎ আছে। কাজ চলার মত একটা সীমারেখা টানা হয়েছে এই মাত্র। ৮৫ পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক প্রান্তিক পর্যায়ে পড়ে—অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ও সাধারণের মাঝখানে। ৮৫-র উপর হলেই তাকে সাধারণ বুদ্ধি বলা হয়। (ফলক-৫.১ দ্রষ্টব্য)

ফলক ৫.১ঃ বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে শ্রেণী ও কাজ

শ্রেণী	বুদ্ধ্যঙ্ক	কাজের পরিধি
মানসিক প্রতিবন্ধী	২৫ ও নীচে	কিছু পারে না। হাঁটা, বসা, এমন কি খাওয়া-পরাতে সাহায্য চাই। কথা বিশেষ কিছু শেখে না।
,,	২৬-৫০	কথা অস্পষ্ট ও সামান্য। পড়াশুনা নামমাত্র। খাওয়া-পরা, পরিষ্কার থাকা—নিজে পারে। বয়স ১৬ ছাড়ালেও ৫।৬ বছরের বাচ্চার মত নজর রাখতে হবে।
,,	৫১-৭০	কথা জড়ানো। দু থেকে পাঁচ ক্লাস। মোটা কাজ—ঘর মোছা, জল আনা, খাম-ঠোঙা বানানো পারবে। কিন্তু স্বাধীন জীবন, সামাজিক দায়িত্ব ও চুক্তি সাধনে অক্ষম (জমি বিক্রী, বিয়ে ইত্যাদি)।
প্রান্তিক	৭১-৮৫	মোটা বুদ্ধি। লেখাপড়া বড় জোর ছ-সাত ক্লাস। আধা দক্ষ কাজ পারবে। গায়ে গতরে খাটা জীবন।
সাধারণ ও বেশী বুদ্ধিমান	৮৬ ও উপরে	বুদ্ধি, শ্রম ও সুযোগ অনুযায়ী শিক্ষা ও পেশা। সমাজ-সংসারের কর্তা।

এটা কি মনের রোগ

মানসিক প্রতিবন্ধী বা প্রান্তিক প্রতিবন্ধীরা মনোরোগী নয়। এ অবস্থাকে আগে মনোরোগের সংগে গণ্ডগোল করে ফেলা হত এবং এখনও আমাদের দেশে হয়।* অথচ আজ থেকে ১৫০ বছর অর্থাৎ বিনেরও ৭০ বছর আগে জাঁ এস্কিরোল এ দুয়ের পার্থক্য অত্যন্ত বিশদ করে বলে গেছেন। তার দুখণ্ড বই প্রকাশিত হওয়ার বছর আষ্টেক বাদে এ বিষয়ে আর একটা বই লেখেন এদুয়ার্দ সেগ্যাঁ। মানসিক প্রতিবন্ধী কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে এতে—যা পরবর্তী কালে ভাষান্তরিত হয়ে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অল্পবুদ্ধি শিশুদের শ্রেণীকরণ নির্বোধ, দুর্বলমনা ও মানসিক পশ্চাৎপদ এবং উনমানসিকতা, জড়বুদ্ধি ইত্যাদি কথা ও ধারণার সৃষ্টি তখন থেকেই—যা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় যে মানসিক রোগ আর এ অবস্থা এক নয়। মানস-মন্দন হল অপরিণত মন। বয়স অনুযায়ী মনের বাড় নেই। পূর্ণতার আগেই সে থেমে যাচ্ছে। তার সম্পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না। শিশুর বয়স যদি ১৪ পেরিয়ে যায় তাহলে এই অবস্থাটা মোটামুটি স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। এর আগেও, তার মানসিক বৃদ্ধি—শারীরিক বৃদ্ধির সমান তালে বাড়ে না। (ফলক-৫.২ দ্রষ্টব্য)

*১৯১২ সালের ভারতীয় উন্মাদ আইনের চোখে দুটোকে এক করে দেখা হয়।

ফলক ৫.২ : মানসিক প্রতিবন্ধী এক শিশুর মানসিক বিকাশের ছক

বয়স	মানসিক বয়স	মানস-মন্দনের পরিমাণ	বুদ্ধ্যঙ্ক	মন্তব্য
(১)	(২)	(১-২)	$(\frac{২}{১}\times ১০০)$	বয়স বাড়ছে। মানসিক
৬ বছর	৪ বছর	২ বছর	৬৭	বিকাশ ঘটছে—মানসিক
৮ বছর	৫·৪ বছর	২·৬ বছর	৬৭	বয়স বাড়ছে। কিন্তু সমান
১০ বছর	৬·৭৫ বছর	৩·২৫ বছর	৬৮	তালে নয়। দুটোর ফারাক
১২ বছর	৮ বছর	৪ বছর	৬৭	ক্রমে বেশী। অথচ বুদ্ধ্যঙ্ক
১৪ বছর	৯·৫ বছর	৪·৫ বছর	৬৮	একই থাকছে।

মুখে কি লেখা থাকে

এটা অবশ্য ঠিক যে, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অনেকের অনেক রকম শারীরিক খুঁত, অসুখবিসুখ ও ব্যবহারিক সমস্যা লেগে থাকে। কারো মানসিক
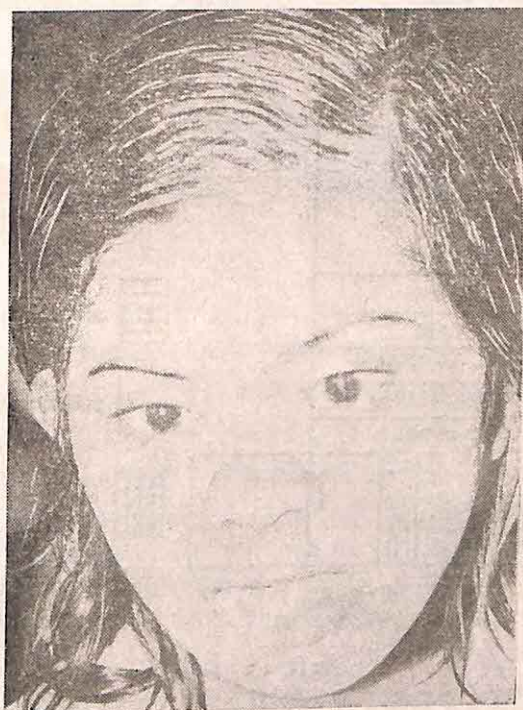
ছবি ৫.১ : অল্পবুদ্ধি শিশু। মঙ্গোল। বয়স ৬ বছর। লক্ষণীয় মুখের গঠন।

ব্যাধি থাকাও বিচিত্র নয়। আর এসব কারণে তাদের চিকিৎসা লাগে। এদের অনেকেরই শারীরিক বৃদ্ধি, আকার ও আয়তন বয়স অনুযায়ী নয়। কেউ দেখতে

ছোটখাট, চামড়া খসখসে, মুখটা গোল। কারো মাথা খুব ছোট বা খুব বড়। কারো চোখের দৃষ্টি কম। কেউ কানে কম শোনে। কারো আঙুল জোড়া বা সংখ্যায় বেশী। কেউ কেউ ঠিকমত হাঁটতে পারে না, হাত পা যেন আটকানো আটকানো—চোখের দৃষ্টি স্থির করতে সময় লাগে, মুখ দিয়ে লালা পড়ে। কারো ফিটের অসুখ আছে বা আছে অন্য কোন মাথার অসুখ (ক্ষত বা প্রদাহ)। কারো ক্রোমোসোমে গোলমাল। কারো বা বিশেষ লবণ, খাদ্যপ্রাণ, অ্যামাইনো অ্যাসিড বা অন্তঃক্ষরা রসের অভাব। বুদ্ধি তো কমই—ভালমন্দর জ্ঞানের অভাব। মেজাজের দিক থেকে তারা কেউ রাগী, কেউ একগুঁয়ে। কেউ বা শান্ত। কেউ বসে বসে দুলতে ভালবাসে। কেউ দুরন্ত ছটপটে। কেউ আঙুল চোষে। কেউ ময়লা খায়। কেউ জিনিস ভাঙে। থুথু দেয়। মারে। কেউ কপাল ঠোকে। কেউ—যথেষ্ট বয়স হয়েছে—তবু কাপড়-বিছানা ভিজিয়ে ফেলে, নোঙরা করে। কেউ কথা শোনে, কেউ বা ভীষণ অবাধ্য।

বিভিন্ন রোগাক্রান্ত অল্পবুদ্ধি শিশু
(আয়তন আনুপাতিক নয়)
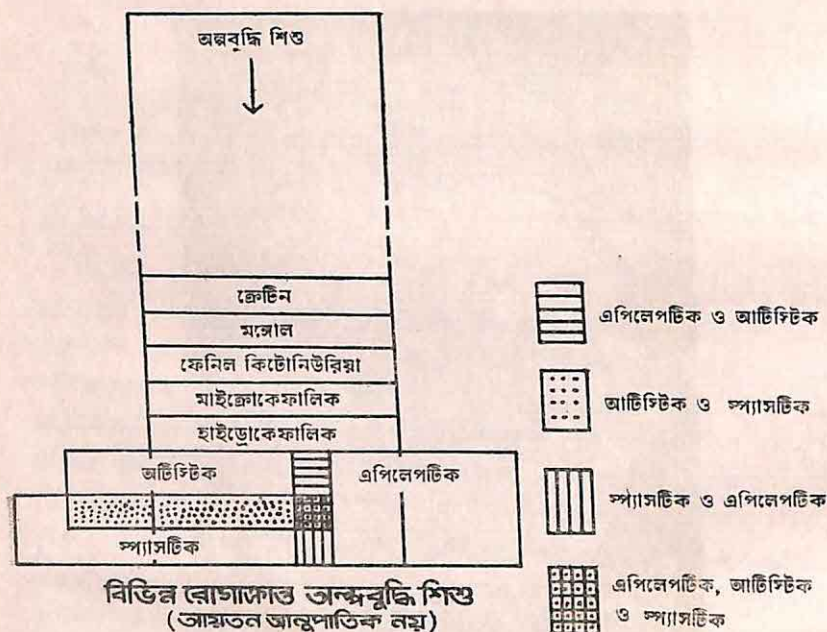
ছবি ৫.২

কি করা যায়

এই ধরনের শিশুদের যেটুকু মানসিক ক্ষমতা থাকে সাধারণ পরিচর্যা ও পরিবেশে তার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। কি বাড়ীতে, কি বিদ্যালয়ে সর্বত্র এদের জন্য দরকার বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা। প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

সরলীকৃত শিক্ষাক্রম ও সহজ প্রশিক্ষণ প্রণালী। এদের বিশেষ শিক্ষালয়ে থাকবে একাধারে চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

ছবি ৫.৩ : অল্পবুদ্ধি শিশু। সেরিব্র্যাল পলসি। বয়স দশ। হাতে ঘাড়ে আড়ষ্টতা।

আমাদের দেশে মানসিক প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র ৪৫ বছর আগে। ১৯৩৭ সালে ডাঃ এস কে বোসের তত্ত্বাবধানে রাঁচীতে এদের জন্য স্বতন্ত্র শুশ্রূষালয় খোলা হয়। কিন্তু চিকিৎসার চাইতে শিক্ষার সমস্যাই এদের বেশী। তাই এর ৪ বছর পর বোম্বাই এবং আরও ১০ বছর বাদে কলকাতায় দুটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। প্রথমটি স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং দ্বিতীয়টি বেসরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট। কিন্তু দুটিতেই মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বেশী গুরুত্ব পায়। ভারত সরকার আরও একটা কেন্দ্র খোলেন দিল্লীতে ১৯৬৪-তে। এ ছাড়া দিল্লী প্রশাসন, অন্ধ্র, গুজরাট, পাঞ্জাব সরকার পরিচালিত একটা করে ও মহারাষ্ট্র সরকারের দুটো অনুরূপ কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গে এরকম সরকারী ব্যবস্থা নেই। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের অধীন কলকাতার বেলেঘাটা ও বারাসতের বৃত্তীয় পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রাধান্য পায় শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরেও তাই। গোটা কুড়ি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কাজ করছেন। অবশ্য এদের কেউ কেউ সরকারী দাক্ষিণ্য পান। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থাও এদের সাহায্য করেন।

সাহারায় একবিন্দু জল

দুঃখের বিষয় প্রয়োজনের তুলনায় এ আয়োজন সামান্য। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা-পরিসংখ্যান-সম্ভাব্যতার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা এক ধরলে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবটা দাঁড়ায় ৫,৪০,০০০। তার দশভাগের একভাগ হিসাবে কলকাতার অঙ্ক হ'ল ৫৪,০০০। এই সংখ্যার বড় অংশ হচ্ছে শিশুরা। নানা কারণে মানসিক প্রতিবন্ধীরা দীর্ঘজীবী নয়। এদের অধিকাংশের মৃত্যু ঘটে শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে। বয়স্ক জনসংখ্যার তুলনায় বয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কম। একশ জন মানসিক প্রতিবন্ধীকে বয়স অনুযায়ী সাজালে মোটামুটি এইরকম ছবি পাওয়া যায়ঃ

ফলক ৫.৩ঃ জনসংখ্যা, বয়সস্তর ও মানসিক প্রতিবন্ধী

বয়স	১-৫ বছর	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-৩০	৩১→	
১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধী	৩৭	২৬	১৯	১২	৫	১	
সাধারণ জনসংখ্যায় বিভিন্ন বয়সীর হার	১৭%	২৫%		৫৮%			১০০
বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যায় মানসিক প্রতিবন্ধীর হার	৪·৩%	৩·৬%		·৬৮%			২%

এর মধ্যে ৬-১৫ বছরের শিশুদের ধরলেই হিসাবটা দাঁড়ায় (শতকরা ২৬+১৯=৪৫ জন হিসাবে) কলকাতার ক্ষেত্রে ২৫,০০০ জন। ১০টি বিশেষ শিক্ষায়তনের ছাত্র নেবার ক্ষমতা গড়ে ৫০ করে ধরলে মোট ৫০০ জন। অতএব প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের আয়োজন পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ।

কিভাবে কাজ হয়

বর্তমানে যে সংস্থাগুলি এই নিয়ে কাজ করে চলেছে—তাদের কাজের ধারা মোটামুটি এরকমঃ (১) মূল্যায়ন (২) পরামর্শ (৩) চিকিৎসা (৪) শিক্ষা (৫) প্রশিক্ষণ ও (৬) নিযুক্তি।

সংস্থাগুলির অর্ধেকের কাজ প্রথম তিনটিতে সীমাবদ্ধ। বাকী অর্ধেক বিশেষ শিক্ষালয় চালান। এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিমূর্ত ধারণা বা প্রতীকের চাইতে

বস্তুর ব্যবহার বেশী এবং কেতাবী লেখাপড়ার চাইতে ব্যবহারিক তালিমের উপর জোর দেওয়া হয়। কথা বলা, গল্প করা, খেলা, নাচ, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, কাগজ কাটা, কাঠ বা প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে নানা জিনিস বানানো, মডেল ও পুতুল তৈরি ইত্যাদি এ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সংগে কোথাও থাকে আরও বাস্তব কাজ

ছবি ৫.৪ : অল্পবুদ্ধি শিশুদের তালিম—নাচ, গান ও খেলা।

শেখানোর ব্যবস্থা—বাক্স, ঠোঙা, খাম তৈরি, বই বাঁধাই, ছিপি বানানো, পুতুল তৈরি, সেলাই, বাগানের কাজ ও হাঁসমুরগী পালন। এই সব শিক্ষা নিকেতনে ভর্তি হওয়ার বয়স ৫ থেকে ২০ বছর। সাধারণ শিক্ষার মান—প্রাথমিক পর্যায়ের।

সমস্যা

প্রতিষ্ঠানগুলির বেশীর ভাগই আবাসিক নয়। অভিভাবকদের পক্ষে শিশুদের ওখানে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা একটা সমস্যা। বহু অভিভাবককে তাই তাদের কাজ কামাই করে, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা বাইরে কোথাও অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া খরচের ব্যাপার আছে। বেতন ও রাহা খরচ নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে বহন করা রীতিমত কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা এই সব শিশুদের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবারই দিতে পারছেন না। তাই অন্য খাতে খরচ করা তাদের পক্ষে বাহুল্য। তবে আশার কথা—কিছু কিছু সমাজসেবী সংস্থা আছেন—যেমন লায়নস্ ক্লাব, রোটারী ক্লাব এবং কয়েকটি মিশনারী সংস্থা এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সমস্যা আছে। সর্বাধিক সমস্যা—জায়গা ও প্রশিক্ষিত

কর্মীর অভাব। এই কাজে যথেষ্ট খোলা-মেলা জায়গা—খেলবার মাঠ, দোলনা, মাছ, পাখি জীবজন্তু ও বাগিচার প্রয়োজন। কিন্তু বেশীর ভাগ আর পাঁচটা সাধারণ স্কুলের মত—ঘিঞ্জি ছোট ছোট ঘরে এই সব সংস্থার কাজ চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ এই কাজে সাফল্যের পরিমাণ উদ্যমের সমানুপাতিক নয়। শৈথিল্য ও হতাশা সহজেই আসতে পারে। তাই কর্মীদের উপযুক্ত মানসিকতা প্রয়োজন। যে ধরনের দক্ষতা ও জ্ঞান এই ধরনের সংস্থা চালাতে লাগে তা তৈরি করে দেওয়ার মত শিক্ষায়তন আমাদের নেই। তাই পরিচালক ও কর্মীরা ঠেকে ঠেকে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিদেশের দেখে শিখছেন। তাই সব কিছুই কেমন আগোছালো মনে হয়।

ছবি ৫.৫ : অল্পবুদ্ধি শিশুদের তালিম—সাজানো, গোনা ও পড়াশোনা।

শুধু পেশাগত দক্ষতা নয়, শুধু নিয়মানুবর্তিতা নয়, কর্মীদের মধ্যে সেবাব্রতীর মনোভাব অত্যন্ত দরকার। না হলে এ কাজে আংশিক সাফল্যও অসম্ভব। নিষ্ঠা ও ভালবাসা এ কাজের মূলমন্ত্র। পেশাগত উন্নতি ও আর্থিক সুবিধা যাদের কাম্য, তাদের এদিকে না-আসাই ভাল।

মনোরোগীদের ভুললে চলবে না

পরিশেষে আর একটি কথা। মানসিক রোগীদের জন্য যেমন নতুন আইন চাই, অল্পবুদ্ধি মানুষদের জন্যও চাই আলাদা আইন। এতদিন ধরে এদেরকে একই আইনের আওতায় দেখা হচ্ছে। অবস্থাটা দুঃখজনক। আবার পুনর্বাসনের প্রয়োজন মানসিক রোগীদেরও। বিশেষ করে যারা অনেকদিন ভুগছেন—পুরনো রুগী

—যাদের সেরে ওঠার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত—তাদেরও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রয়োজন। তবে এর কাঠামোটা হবে একটু অন্যরকম। চিকিৎসা, কর্মকেন্দ্র ও প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে এতে। আর এই সব পুনর্বাসন কেন্দ্র—মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যই হোক আর পুরনো মানসিক রোগীদের জন্যই হোক—কলকাতা থেকে একটু দূরে, গ্রামের পরিবেশে হলে ভাল হয়। আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে—তবে কড়াকড়ি কিছু নয়—যার যখন খুশি বাড়ী যেতে পারবে—যতদিন খুশি থাকবে। এই সব কেন্দ্রে থাকবে—তাঁত, সেলাই কল, কাঠের কাজ, বই বাঁধাই, ঠোঙা ও বাক্স বানানোর ব্যবস্থা। আবার ওদিকে মাঠের ও বাগানের কাজ। মৌমাছি পালন। মুরগীর খামার। দেখা যাবে কেউ কাজ করছে। কেউ গান করছে। কেউ বা শুধুই পুকুর পাড়ে কলাগাছের ছায়ায় বসে আছে। আকাশে মেঘ ভেসে যায়। জলে ছায়া পড়ে। হাঁসে সাতার কাটে। দূরে ঘুঘু ডাকছে। মনটা জুড়িয়ে যায়। প্রত্যয় হয় মানুষ প্রকৃতিরই একটা অঙ্গ এবং অবিচ্ছেদ্য। নগর সভ্যতা, শিল্পায়ন এবং প্রতিযোগিতার কালে একথা আমাদের ভাবতেই হবে। মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে তা একান্ত জরুরী।

পর্ব দুই

অল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে কয়েকটি সংকেত

এগুলি অপরিবর্তনীয় নির্দেশ নয়। প্রতিটি শিশুর বুদ্ধি ও মেজাজ অনুযায়ী অদল-বদল করে নিন।

[ক] সাধারণ সূত্র ঃ

১। অল্পবুদ্ধি শিশুকে তার থেকে কম পক্ষে দু বছরের ছোট শিশু বলে ভেবে নিন।

২। শিশুর মাতা পিতা প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। শেখানোর কাজে তাদের নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে অবশ্য বাইরের শিক্ষক নিতেই হয়। শিক্ষক পণ্ডিত না হলেও চলবে। সংবেদনশীল হওয়া চাই।

৩। ওকে অন্য শিশুর চাইতে বেশী নজর দিন।

৪। (ক) বিমূর্তের বদলে মূর্ত, প্রতীকের চাইতে আসল বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সাহায্যে শেখান।

(খ) একটানা পড়াতে নেই। প্রথম দিকে ১০/১৫ মিনিট করে দিনে দুবার বসলেই চলবে। আস্তে আস্তে সময় ও শিক্ষার বিষয় বাড়াতে হবে।

(গ) শেখানর বিষয়গুলি বার বার বলতে হবে। মাঝে মাঝে পুরনো পাঠ ঝালানো চাই।

(ঘ) শিক্ষাদান যেন কেবল প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়।

(ঙ) মাঝে মাঝে তাকে নিজের মত ছেড়ে দিন।

৫। আঁকি বুকি কাটার জন্য রঙিন খড়ি ও পেনসিল দিন।

৬। ওকে ছড়া, কবিতা ও গান শোনান। বারে বারে শোনান।

৭। খেলাধুলা করতে দিন ও করান। অন্য বাচ্চাদের সংগে মিশতে দিন।

৮। শিক্ষা চলাকালে পুরস্কার বা শাস্তি হবে স্পষ্ট, তাৎক্ষণিক ও সংক্ষিপ্ত।

৯। চঞ্চলতা, অন্য ব্যবহারিক সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা বা অসুখ বিসুখ থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

১০। অন্য জটিলতা না থাকলে, মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ বছরে শিশু কথা বলবে ও দশ বছরে কিছু না কিছু লিখতে পড়তে পারবে। নিজের কাজ—জামা-জুতো পরা, নিজ হাতে খাওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারবে। যদি না পারে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে তাকে ঠিকমত শেখানো হয়নি। হয় তার কাজগুলো করে দেওয়া হয়েছে অথবা তাকে অবহেলা করা হয়েছে। যারা বুদ্ধির বেশীরকম ঘাটতির জন্য এ সব কাজ পারে না, তাদের সংখ্যা বিরল।

[খ] **কথা শেখান ঃ**

১। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির নাম
(ক) পা হাত মাথা
(খ) মুখ নাক চোখ কান আঙুল
(গ) চুল দাঁত ঠোঁট ডান হাত, ডান পা, বাঁ হাত বাঁ পা, নখ
২। বাড়ির লোকদের সম্বোধন
(ক) বাবা মা
(খ) দাদা দিদি
(গ) মামা কাকা পিসি

৩। খাওয়া, পরা, শোয়া ও শিশুর অন্যান্য ব্যবহারের জিনিসের নাম, কাজ ও বিশেষণ। যেমন, জামা—লাল জামা। দুধ—দুধ খাই।

৪। ঘরের ও চারপাশের বস্তু ও জীবজগৎ।

১ থেকে ৪ এক সংগে চলতে পারে। কথার সংখ্যা ও জটিলতা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। ওর সংগে কথা বলে যান। প্রথমে সে হয়ত কিছু বলবে না। শুধু শুনবে। পরে সে বলবেই।

৫। ছবির বই নিয়ে বসুন। ছবি দেখিয়ে বলে যান—ফুল, আম, বিড়াল, গাড়ি ইত্যাদি।

[গ] **গুনতে শেখান ঃ**

শিক্ষণ সামগ্রী দশটা কাঠের টুকরো—১"×১"×১"

১। পাঁচটা পাশাপাশি সাজান। আঙুল ছুঁইয়ে গুনতে শেখান। প্রথমে নিজে গুনুন। পরে শিশুর হাত ধরে ওর আঙুল ছুঁইয়ে গুনুন। তারপর আপনি গুনুন, ও আঙুল ছোঁয়াক। এর পর ওকে বলতে বলুন।

২। এই পাঁচটার সাহায্যে যোগ ও বিয়োগ শেখান। এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচের ধারণা তৈরী হয়ে গেলে যোগ বিয়োগ শেখাতে নিচের মত করুন ঃ—

১+৪ =৫
২+৩ =৫
(একটা অন্য চারটা থেকে ও দুটো অন্য তিনটে থেকে দূরে সাজিয়ে যোগ শেখান)

৫−১=৪
৫−২=৩
৫−৩=২
৫−৪=১
(পাঁচটি টুকরো পাশাপাশি রেখে একটা সরিয়ে নিন জিজ্ঞাসা করুন কটা রইল ? এই ভাবে)

৩। আরও পাঁচটা টুকরো নিয়ে এবার পাশাপাশি দশটা সাজান ও গুনতে শেখান।

যোগ বিয়োগ শেখান। শেখার পরিমাণ এবার অনেক বাড়বে।

১+৯=১০ ২+৮=১০ ৩+৭=১০ ৪+৬=১০ ৫+৫=১০

১০−১=৯ ১০−২=৮ ১০−৩=৭ ১০−৪=৬ ১০−৫=৫

প্রয়োজনে এই পর্ব তিন ভাগে শেখান : ১−৪, ১−৭, ১−১০।

[ঘ] **পড়া :**

প্রচলিত বর্ণমালার বিন্যাসে বদল দরকার।

১। স্বরবর্ণের ছটা—অ আ ই উ এ ও প্রথম শিখুক। অন্যগুলো পরে হবে। তার মধ্যে ঈ ঐ বেশী দরকার। অন্যগুলো না হলেও চলবে।

২। ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার ধারাটা হোক এরকম :

ব প ম
ত দ ন
চ জ
ট ড
ক গ ঙ
র ল স হ

শিশুদের কথা বলার স্বাভাবিক বিকাশের দিক ও উচ্চারণের ক্রম, জটিলতার কথা বিবেচনা করে এই বর্ণগুলির পর্যায় ঠিক করা হয়েছে। সুরু ওষ্ঠ বর্ণ দিয়ে। শেষ হয়েছে কণ্ঠ ও মহাপ্রাণে।

৩। ফ ভ
থ ধ
ছ ঝ
ঠ ঢ
খ ঘ

এগুলো পরে শিখবে।

৪। আ=া ই=ি উ=ু এ=ে ও=ো

ব+আ=বা প+ই=পি দ+উ=দু ক+এ=কে ম+ও=মো

চ+আ=চা ম+ই=মি ল+উ=লু প+এ=পে ছ+ও=ছো

৫। সোজা কথা দু অক্ষরে—অ, আ, ই-কার যুক্ত। লেখা পড়া দুই চলবে।

বাবা মাথা হাত দাদা দিদি
মামা কান জামা টাকা বাটি
আম পাতা জল চিনি

৬। দু অক্ষরের উ, এ, ও-কার যুক্ত শব্দ তৈরি করে নিন। শিশুর ব্যবহারের বস্তু হলেই ভাল।

আলু জুতো পেপে
দুধ মোজা লেবু
লাল জুতো নীল মোজা
পাকা পেপে টক লেবু
দুধ খাও বই নাও ঘরে যাও

৭। তিন অক্ষরের শব্দ। ছোট বাক্য। সাধারণ বই থেকে বেছে নিজের মত করে নিন।

[ঙ] **লেখা শেখান ঃ**

শিক্ষণসামগ্রী—শ্লেট পেনসিল। মেঝেতে খড়ি দিয়ে লেখা চলতে পারে।

১. শুধু গোল আঁকা

২. সোজা দাঁড়ি

৩. সোজা রেখা

৪. কোণাকুণি রেখা। চৌকো ঘর এঁকে দিয়ে তার মধ্যে শেখান।

৫. চৌকো ঘর আঁকুন। ডান দিকের উপর কোণ থেকে বাঁ দিকের দাঁড়ির মাঝখানে রেখা টানতে শেখান।

৬. চৌকো ঘরের ডান উপর কোণ থেকে বাঁ দিকে দাঁড়ির মধ্যবিন্দু ও সেখান থেকে ডান দিকে নিচের কোণ পর্যন্ত রেখা টানতে শেখান।

৭. এবার অঙ্ক লেখান। বলুন। বলতে বলুন।

০ ১ ১০ ৭ ৩ ৯ ৮ ৬ ৫ ২ ৪

এর আগে তার লেখার যে প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে এবং আঙুল চালানোর উপর যে নিয়ন্ত্রণ এসেছে তাতে অঙ্কগুলি এই পর্যায় ক্রমে লিখলে সুবিধা হবে। যেমন বৃত্ত সে আঁকতে শিখেছে। অতএব অর্ধবৃত্ত এঁকে নিচের দিকে ছোট বৃত্ত আঁকলেই তার ৯ লেখা হল। এরপব ১ এর গায়ে একটা গোল আঁকলে হল ১০। গোলের সংগে দাঁড়ি টানলে ৭ হল। গুনতে সে আগেই শিখেছে। তার সংগে মিলিয়ে দিতে হবে। তাহলে গোলমাল হবে না। কাঠের টুকরোগুলো সামনে রাখুন।

৮। বর্ণমালা কয়েকটা লিখুক।

অ আ ই উ এ ও

ব র ক ধ

৯। পড়ার ৫ নং লেখাতে শুরু করুণ। লেখা পড়া এক সংগে চলুক।

মোটামুটি হিসাবে এই শিক্ষাকাল দুবছর। এভাবে শেখালে সে এর পর সাধারণ শিশুদের বই পড়তে পারবে।

গোনার ব্যাপারে নতুন চিন্তা (কর-পদ্ধতি)

বাঙলায় এক থেকে একশ গুণতে প্রায় একশটা কথা শিখতে হয়। আর অনেক বিভ্রান্তি আছে। অথচ একটু বদলে নিলে, বোঝাটা হাল্কা হয়।

অল্পবুদ্ধি শিশুদের শেখাতে গিয়ে ও তাদের শিক্ষকদের পড়াতে গিয়ে এ চিন্তাটার জন্ম। মনে হয় এ পদ্ধতিতে শেখার ব্যাপারটা সোজা হবে। অতএব শেখানোটাও। গুণীজন ভেবে দেখুন। "আমার হাতে নেই ভুবনের ভার।" সবাই না মানলে আমার এ পদ্ধতি কাজে আসবে না।

ধরা যাক একটা সংখ্যা 13। কোন্ ভাষায় একে কি বলে শোনা হোক :

	বাঙলা	হিন্দী	সংস্কৃত	ইংরেজী	কানাড়া
13	তেরো (ত্যারো)	তেরা	ত্রয়োদশ	থারটিন	হাথমুরু

মন্তব্য : 10 দশ 3 তিন যোগফলে ও 1 3 পাশাপাশি লিখে 13-র সৃষ্টি। তেরো শব্দটাতে দশ কথাটি অনুপস্থিত। তিন কথাটির আভাস আছে। ইংরাজীতে থ্রি হয়েছে থার, টেন হয়েছে টিন। কিন্তু কানাড়ার হাথ্থু (মানে দশ) ও মুরু (মানে তিন) কথা দুটি অঙ্কের মত পাশাপাশি বিদ্যমান। আরও লক্ষণীয় যে, ইংরেজীতে রাশিটির উচ্চারণে পর্যায়ক্রম রক্ষা করা হয়নি। অর্থাৎ অঙ্কে আছে টেন (10) থ্রি (3) অথচ বলছি থ্রি (থার) টেন (টিন)। সংস্কৃতেও তাই। দশোত্রয় না বলে বলা হয় ত্রয়োদশ। সে দিক থেকে কানাড়া সবচেয়ে ঠিক। অঙ্ক, কথা ও লেখায় পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয়। মনে রাখা দরকার আমরা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখি।

এবার ধরা যাক 27।

	বাঙলা	হিন্দী	সংস্কৃত	ইংরেজী
27	সাতাশ	সাতাইশ	সপ্তবিংশ	টোয়েন্টিসেভেন

বাঙলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে, সপ্ত (সাত) ও বিংশ (বিশ) কথা দুটি জুড়ে শব্দগুলির সৃষ্টি। কিন্তু অঙ্কের সংগে কথার পর্যায় লক্ষ্য করুন—উল্টো। অঙ্কে লেখা হচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডানে অথচ বলা হচ্ছে ডান থেকে বামে। ইংরেজীতে কিন্তু এখন আগের দোষ শুধরে নেওয়া হয়েছে। টোয়েন্টি (20) ও সেভেন (7) অঙ্কে এবং কথায় পাশাপাশি—বাঁ থেকে ডানে। বাঙলায় এ গোলমাল অনন্ত। তারপর আছে ঊনত্রিশ, ঊনপঞ্চাশের ঝামেলা। অঙ্কে লিখতে গিয়ে গণ্ডগোল হয়ে যায়।*

তাই প্রস্তাব :

১। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ ও শূন্য—কথাগুলি থাকুক।

২। এবার প্রতি দশ স্তরে একটা করে কথা থাক। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই ও (এক)-শ।

৩। এই কুড়িটা ছাড়া, একশ' পর্যন্ত বাকী কথাগুলি তুলে দেওয়া হোক।

৪। ১ এবং ২ এর কথাগুলির সাহায্যে সব গণনার কাজ চলুক। যেমন ১১→ দশ এক, ১২→দশ দুই, ২৩→বিশ তিন, ৪৫→চল্লিশ পাঁচ ইত্যাদি।

* শুধু বাংলা কেন, সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের সমস্ত ভাষাতে—বিশেষ করে যে গুলোর সংস্কৃত থেকে জন্ম তাতেই আছে এ ধরনের গোলমাল।

৫। সংক্ষেপে এই হ'লো কর-পদ্ধতি।

৬। ইংরেজীতে বদলাতে হবে মাত্র ইলেভ্‌ন্‌ থেকে নাইনটিন পর্যন্ত। তারা হবে টেন ওয়ান, টেন টু…টেন নাইন। তারপর ঠিক আছে।*

৭। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতে এই পরিবর্তন আনা যেতে পারে। মাত্র বিশটি কথা আর জোড়া-কথা। এক শ পর্যন্ত গোনা শেষ।**

সবাই একটু ভেবে দেখুন। বুদ্ধিমানদের জন্য চিন্তা নেই। এতে পৃথিবীর ২৫ কোটী কমবুদ্ধি মানুষের শিক্ষার কাজটা হালকা হবে। ন্যূন-শ্রুতি শিশুদের কম কথা শিখতে হবে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গোনা রপ্ত করাটাও হবে সোজা। আসুন না, পৃথিবীর দুর্বল মানুষের কল্যাণে এই সামান্য জিনিসটা বদলে দিই।

---

* পর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষায় এইভাবে বলা হয় ১৬ ও ১৭ থেকে ১৯ পর্যন্ত। সুতরাং এই দুই ভাষায় ইংরেজীর চেয়ে পরিবর্তন দরকার হবে কম।

** ২০, ৩০…৯০কে দু'দশ. তিন দশ…ন'দশ বললে মূল শব্দ সংখ্যা আরো কমে যাবে ও গণনার কাজ সহজ হবে। আমাদের দেশে এই রীতি রয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে। অবশ্য উচ্চারণের সুবিধার জন্য সামান্য কিছু অদল-বদল আছে।
পরে জেনে আশ্চর্য হয়ে গেছি, যে পৃথিবীর বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা চীনাতে পুরো এই পদ্ধতি (অর্থাৎ ১২=দশ দুই, ২০=দুই দশ, ২১=দুই দশ এক)। আর রুশ ভাষাতেও ৫০, ৬০, ৭০ ও ৮০-কে এইভাবে বলা হয় (অর্থাৎ পাঁচদশ, ছয়দশ ইত্যাদি)।

পর্ব তিন

মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণব্রতী পশ্চিমবঙ্গের সংস্থা (বর্ণানুক্রমে) ঃ

১। অলকেন্দু বোধ নিকেতন ; কাঁকুড়গাছি, ভি, আই, পি, রোড, কলকাতা।
২। আশুতোষ ইনস্টিটিশন ; ১৪, রহিম ওস্তাগর রোড, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৪৫।
৩। আশা নিকেতন, ২০৩, এ. পি. সি. রোড, শিয়ালদহ, কলকাতা।
৪। ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশনাল রিসার্চ ; প্রিন্স আনওয়ার শাহ্ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা।
৫। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্প্যাস্টিক সোসাইটি ; সেনা ছাউনি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯।
৬। কেয়ার অ্যাণ্ড কাউনসেলিং সেন্টার ঃ (স্পেশ্যাল স্কুল ফর ডিজেবল্ড্ চিলড্রেন), ৭৬এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ (প্রবেশ ম্যুলেন স্ট্রীট্), কলকাতা-২০।
৭। চাইল্ড গাইডেন্স সেন্টার ; ৭ মদন মিত্র রোড, কলকাতা-১২।
৮। প্রবুদ্ধ ; ৭০৯।১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-৩৪।
৯। ব্যুরো অফ সাইকোলজিক্যাল গাইডেন্স ; ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯।
১০। বোধিপীঠ ; ২০, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা-৯।
১১। ভোকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন্ সেন্টার, শ্রমমন্ত্রক, ভারত সরকার ; ৩৮, বদন রায় রোড, কলকাতা-১০।*
১২। মনোবিকাশ কেন্দ্র ; ১১, প্রিটোরিয়া স্ট্রীট্, কলকাতা-১৬।
১৩। মানস, মডার্ন স্কুল (নতুন বাড়ী) ; ১৭বি, এম, রায়চৌধুরী রোড, পার্কসার্কাস, কলকাতা-১৭।**
১৪। রাঘবেন্দ্র হোম ফর মেন্টালি রিটারডেড্ চিল্ড্রেন। রামরাজাতলা, হাওড়া।
১৫। রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর চিল্ড্রেন ; ৫৯ মতিলাল গুপ্ত রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮।*
১৬। রিহ্যাব-ইণ্ডিয়া ; পি ৯১, হেলেন কেলার সরণী, মাঝেরহাট ব্রীজ, কলকাতা-৮৮।*
১৭। রীচ্ ; ২৪১ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮।
১৮। সহমর্মী ; ১০০বি কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৭।**
১৯। সেন্ট জেভিয়ার্স জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল ; পোঃ বাসন্তী, ভায়া ক্যানিং, ২৪-পরগনা।
২০। স্পীচ্ অ্যাণ্ড হীয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট ; ১বি, রিচি রোড, কলকাতা-১৯।*
২১। হোম ফর মেন্টালি রিটার্ডেড্, মিশনারিজ অব চ্যারিটি ; নুরপুর, ২৪-পরগনা।

---

*প্রধানতঃ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য
**প্রধানতঃ মানসিক রোগীদের জন্য

বিনে

কোন কম্পুটার নয়, নয় কোন আজব কল। মাত্র তিরিশ দফা প্রশ্নের এক তালিকা। বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রাদ বিনে। বিংশ শতাব্দীর সবে শুরু, ঘটনা স্থল পারী। ব্যাপার কি, কর্তাব্যক্তিদের কিছুকাল ঘুম ছিল না, শহরের স্কুলগুলোতে কিছু কিছু পড়ুয়া পড়াশুনায় পেছিয়ে পড়ছে কেন। ওদের কি ভাবে নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাছাই করা যায়? ওদের জন্য কি বিশেষ বিদ্যালয় করা উচিত? তা যদি করতে হয় ভর্তির নিয়ম কি হবে? কি করে বোঝা যাবে একজন নতুন আবেদককে যে সে সাধারণ বিদ্যালয়ের অনুপযুক্ত! এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তলব পড়ল বিনে এবং সিমঁর। একজন মনোবিজ্ঞানী। অন্যজন চিকিৎসক। ওঁদের এই অনুসন্ধানের ফল হল যুগান্তকারী। ১৯০৫ সালে বিনে-সিম* নামে পরিচিত তাঁদের পরীক্ষা পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করল। শিশুর মানসিক বিকাশকে একটা সুনির্দিষ্ট মানের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হল।

দিকে দিকে

এটাই হল বিশ্বের প্রথম স্বীকৃত বুদ্ধিমাপার যন্ত্র। ১৯০৮ সালে এর কিছু অদল-বদল হল। দফাগুলি শুধু কঠিনতার ক্রমান্বয়ে নয়, বয়স স্তরেও সাজান হল—৩ থেকে ১৩ বছর। সাড়া পড়ে গেল সারা ইয়োরোপে। বেলজিয়ম, জার্মানী ও ইতালী এই পদ্ধতি লুফে নিল। বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা এবং এর উপর চলল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আবার সংশোধন। ১৯১১ সালে। আর দুঃখের কথা, বিনে ওই সালেই মারা গেলেন।

সমুদ্রপারে

কিন্তু তাঁর কাজ ততদিনে প্রচণ্ড আগ্রহের সঞ্চার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। গোড্ডার্ড ইংরেজী ভাষায় এই পরীক্ষা চালু করলেন ওই ১৯১১ সালেই। এগিয়ে এল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বাধিক কাজ হল। কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা! কত নমুনা সংগ্রহ! কত পর্যবেক্ষণ! পরিবর্তন! সংশোধন। গোড্ডার্ডের পর কুহ্‌লমান। তারপর টারম্যান ও মেরীল। পৃথিবীর সমস্ত ইংরেজী ভাষী এলাকায় টারম্যান-মেরীল নামে ছড়িয়ে পড়ল বিনে-সিম* আবিষ্কৃত এই পরীক্ষা পদ্ধতি। এর নিরিখে আজও বিচার করা হয় যে-কোন নব উদ্ভাবিত বুদ্ধি-পরীক্ষা।

চিচিং ফাঁক

আসলে কৌশলটা কি? কৌশলটা হল—এতে আছে মানুষের কয়েকটা ব্যবহারিক বিবরণ বা প্রশ্ন। নমুনার মত। যা দিয়ে তার সামগ্রিক ব্যবহারের আন্দাজ পাওয়া যায়। যেমন হাঁড়ির দুএকটা ভাত টিপলে অন্য ভাতের অবস্থা বোঝা যায়। দফাগুলি কঠিনতার ক্রমান্বয়ে সাজান। সাজান বয়সস্তরে। প্রত্যেক বয়সস্তরের বিবরণগুলো মিলে যাবে সেই বয়সের শতকরা ৫০
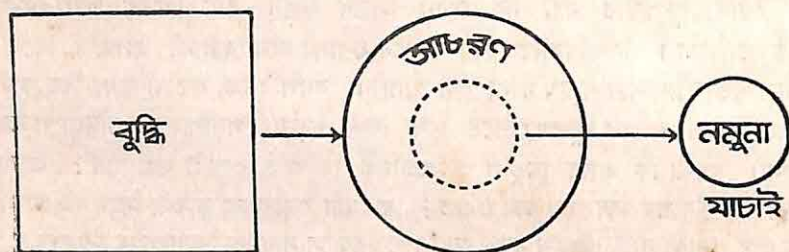
ছবি ৬.১ :

জন ছেলেমেয়ের মধ্যে। শতকরা ২৫ জন এই স্তর ছাড়িয়ে যাবে। বাকী ২৫ জন এই স্তরের সবগুলো পারবে না—অর্থাৎ পেছিয়ে থাকবে। বেশ ভেবে চিন্তে এই দফাগুলো তৈরি করা হয়েছে। পরে পরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে—বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ব্যবহারিক ও চিন্তাশক্তির পারঙ্গমতা দেখে, কোন কোন বিবরণ বর্জিত বা সংশোধিত হয়েছে। দরকারে নতুন দফা ঢোকান হয়েছে। এখন ধরা যাক একজন পরীক্ষার্থী নিয়ে সে এই প্রশ্নের সিঁড়িতে কতটা যেতে পারে দেখা হল। দেখা হল, তার সমবয়সীদের তুলনায় সে কোথায় দাঁড়াচ্ছে। সে সামনে, এগিয়ে, না পিছিয়ে। এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকলে কতটা। এই আপেক্ষিক অবস্থান নির্দেশ করবে তার মানসিক বিকাশের পরিমাণ। আর মূলগতভাবে এটাই তার ধীশক্তির মাপ বা বুদ্ধির ওজন।

পূর্বসূরী

বিনে-সিমঁর এই মাপকাঠি দিয়ে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল অল্প-বুদ্ধি শিশুদের—যাদের প্রয়োজন ছিল বিশেষ শিক্ষার। অল্পবুদ্ধি বা মানস-মন্দন তত্ত্বটা নতুন কিছু নয়। সমস্ত মানুষের মানসিক ক্ষমতা যে এক নয়, তার একটা ক্রম আছে, এ তত্ত্বও নতুন নয়। কিন্তু ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ শুরু হল বিনের পর থেকে এবং এদের সংখ্যা-বিজ্ঞানের আওতায় আনতে সাহায্য করল বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি। এর আগে ১৮৩৮, সালে জাঁ এসকিরোল মানস-মন্দনকে মনোরোগ থেকে পৃথক করেন ও এর বিভিন্ন স্তরের কথা বলেন। আর ১৮৪২ য়ে

মানসিক প্রতিবন্ধীদের এক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন এদুয়ার্দ সেগ্যাঁ। অল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে তিনি ছিলেন পুরোধা। এ বিষয়ে তিনিও একটা বই লেখেন ১৮৪৬ সালে। এ বই পুনঃপ্রকাশিত হয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরজীতে ১৯০৭ সালে। তার নামাঙ্কিত ফরম বোর্ড আজও অত্যন্ত পরিচিত শিশুদের বুদ্ধি মাপা ও প্রশিক্ষণের কাজে।

আরও মানসিক পরীক্ষা বা বুদ্ধিমাপার উপায়

মানসিক পরীক্ষা কথাটা চালু করেছিলেন জেমস ম্যাক্‌কিন ক্যাটেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯০ সালে। তার পদ্ধতিতে ছিল স্মৃতি, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির পরীক্ষা। কিন্তু বিনে-সিমঁর বুদ্ধি মাপার পদ্ধতি সে সব ভাসিয়ে দিল। ১৯১১ সালের পর শুধু ইংরেজী ভাষাতেই এর অনেকগুলো অনুকৃতি বেরিয়ে এল—১৯১৬, ১৯৩৭ এবং ১৯৬০ সালে। এদিকে ১৯১৭ সালে মার্কিন মুলুকে বেরুল এমন এক জোড়া পদ্ধতি যার সাহায্যে অল্পশিক্ষিত অনেকগুলি বয়স্ক মানুষকে পরীক্ষা করা যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন সৈনিক নেবার সময় এই দুটো বহুল ব্যবহৃত হল। আরমি আলফা ও বীটা টেস্ট। একটি মৌখিক এবং অপরটি অমৌখিক—যাতে ভাষার পারদর্শিতা প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে আর একটি পরীক্ষা আবিষ্কৃত হল—প্রোগ্রেসিভ ম্যাট্রিসেস্ টেস্ট। এতে ব্যবহার করা হয়েছে নানা আকৃতির নকশা। জে. সি. র‍্যাভেন কৃত এই পরীক্ষা সরল ও রঙিন করে শিশুদের বেলায় ব্যবহার হয়। এই পরীক্ষা দুটি বেশ নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া যারা কথা বলতে পারে না, বা কানে শোনে না বা অল্পশিক্ষিত তাদের জন্যে এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। অনুরূপ পরীক্ষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলেকজান্ডার ও কোহ্‌জ আবিষ্কৃত যন্ত্র যার উপদান হল কাঠের রঙিন টুকরো, কাঠের ডালা ও কিছু কাগজে আঁকা নকশা। এই ধরনের পরীক্ষাগুলিকে বলা হয় অমৌখিক অথবা কাজের মাধ্যমে বুদ্ধি মাপার পদ্ধতি।

এই দুই পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটল ডেভিড বেক্‌সলারের পরীক্ষায়। ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। সংশোধিত রূপ বেরুল ছোটদের জন্য ১৯৪৫ এবং বড়দের জন্য ১৯৫৫ সালে। মৌখিক ও অমৌখিক উপাদানে তৈরি এই পরীক্ষা দুটির দফাগুলি বয়সস্তর অনুযায়ী সাজান নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজ অনুযায়ী বিষয় ও তার কঠিনতার ক্রমান্বয়ে সাজান। পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে তার বয়স হিসাবে সরাসরি বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায়। বর্তমানে বেক্‌সলারের এই দুই পদ্ধতি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ এর দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

খুব ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশ পরিমাপ করার কাজে গেসেল ও ক্যাটেল

কয়েকটা তফসিল ব্যবহার করেন। তাঁদের নামাঙ্কিত এই নির্দেশিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৫, ১৯৪০ ও ১৯৪৭ সালে।

ভারত

আমাদের দেশে বুদ্ধিমাপার পদ্ধতিগুলি বেশীর ভাগই তৈরি বিদেশীদের অনুবাদ, অনুকরণ বা অনুসরণে। মৌখিক পরীক্ষাগুলি ভাষানির্ভর এবং অমৌখিক পরীক্ষাগুলি ভাষা নির্ভর না হলেও কিছুটা সংস্কৃতি নির্ভর তো বটে। তাই ভাষা ও কৃষ্টির প্রভাব যথাসম্ভব কমিয়ে এই পরীক্ষাগুলিকে আমাদের দেশের যথাযোগ্য বা আঞ্চলিক করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৬০ সালে কুলশ্রেষ্ঠ বিনে-সিমঁর (টারম্যান-মেরীল থেকে) ভারতীয়করণ (হিন্দী) করেন। মারাঠি ভাষায় হ'ল বিনে-কামাথ টেস্ট। হিন্দী ভাষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষানির্মাতা হলেন, জোসী, ট্যাণ্ডন ও জালোটা। ভাষার দূরত্ব এড়ানোর জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা ব্যাপক ব্যবহার হয়—সেটি হল, "ভাটিয়া ব্যাটারি অব পারফরম্যান্স টেস্ট্‌স ফর ইনটেলিজেন্স।" এটিতে, আলেকজান্ডারের পাস অ্যালঙ, কোহ্‌জ-এর ব্লক ডিজাইন ইত্যাদি বহুপরীক্ষিত অমৌখিক পরীক্ষার কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে।

মজুমদার ১৯৬০ সালে বেক্‌সলারের বঙ্গানুবাদ নিয়ে কাজ করেন। বর্তমান লেখক বেক্‌সলারের মৌখিক পদ্ধতির আদলে বাংলা ভাষায় তৈরি পরীক্ষা দিয়ে ১৯৭০ সালে ৫০০ জন মৃগীরোগীর বুদ্ধি পরিমাপ করেন। পরবর্তী চার বছরে তাদের অনেককে পুনরায় পরীক্ষা করা হয় এবং এতে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। বেক্‌সলারের বড়দের জন্য অমৌখিক পরীক্ষার অনুরূপ তৈরি করেছেন শ্রীমতী রামলিঙ্গস্বামী। ভারতীয় ভাষায় তৈরি কোন একটি মৌখিক পরীক্ষা সর্বত্র গৃহীত হতে পারে না—কারণ মৌখিক পরীক্ষা ভাষানির্ভর এবং ভারত একটা বহুভাষী দেশ এবং দ্বিতীয়তঃ, এখানে শিক্ষার হার কম। এ অসুবিধা এড়ানো যায় অনুবাদের সাহায্যে এবং আরও নির্ভরযোগ্য অমৌখিক পরীক্ষা চালু করলে।

বুদ্ধিমাপা যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

বুদ্ধি পরিমাপ যন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে যে এই মাপকাঠি দিয়ে যেন বুদ্ধি মাপা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তার উপযোগী হওয়া চাই এই মাপকাঠির। যেমন কিলোগ্রাম বা তার ছোট কোন বাটকারা দিয়ে মাপা যায় না দূরত্ব। দূরত্ব মাপতে হলে চাই মিটার কাঠি বা ফিতে। তেমনি বুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তার যথাযোগ্য হওয়া চাই বুদ্ধিমাপা কলটি। এই গুণটাকে বলে ভ্যালিডিটি বা বৈধতা। অর্থাৎ মাপার যন্ত্রটি হবে বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ এ দিয়ে মাপলে একটা জিনিসের মাপ বারে বারে যেন একই হয়। এই

গুণটাকে বলে রিলায়েবিলিটি বা নির্ভরযোগ্যতা। বৈধ ও নির্ভরযোগ্য যে কোন পরিমাপ যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এ গুণ দুটি বুদ্ধিমাপা যন্ত্রেরও থাকতে হবে।

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে যে, এটা এমন একটা উঁচু মানের যন্ত্র যা দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের যে কোন বিশেষ দিক সম্বন্ধে একটা বাস্তব ও নিরপেক্ষ পরিমাপ সম্ভব। এজন্য তার কথা, কাজ ও ব্যবহারের নমুনা নেওয়া হয়। বুদ্ধিমাপনী যেহেতু একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, তার ক্ষেত্রেও এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য এবং যেহেতু মানুষের বুদ্ধির প্রকাশ তার কথায়, কাজে ও চিন্তায়, তাদের নমুনা নিতে হবে। পরীক্ষায় গৃহীত নমুনাগুলিকে হতে হবে তার সার্মাগ্রক মানসিক ক্ষমতার যথার্থ প্রতিনিধি।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিমাপা ব্যাপারটা পরোক্ষ। বুদ্ধি সরাসরি মাপা যায় না। ও হয় না। পরোক্ষ মাপ বলে তা অবৈজ্ঞানিক—এ সমালোচনা কেউ কেউ করেন। অথচ পদার্থ জগতে কতই না পরোক্ষ মাপ চালু আছে—যেমন, পাহাড়ের উচ্চতা,

ছবি ৬.২ : গ-কে মেপে ক সম্বন্ধে ধারণা : বুদ্ধিমাপা

সমুদ্রের গভীরতা, চাঁদের দূরত্ব ইত্যাদি। নমুনা থেকে সমগ্রের ধারণার নিরিখও ভূরিভূরি, যথা—জমির ফসল, দুধের ঘনত্ব, আকরিকে লোহা বা রক্তে চিনির পরিমাণ।

তৃতীয়ত, একটা বুদ্ধিমাপা যন্ত্রে যদি বেশ কিছু লোকের বুদ্ধি মাপা যায় এবং সেই ফল যদি একটা কাগজে দ্বিমাত্রায় (একদিকে বুদ্ধির পরিমাপ, অন্যদিকে জন-সংখ্যা) আঁকা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে একটা ঘন্টার মত আকৃতির বক্ররেখা উৎপন্ন হয়েছে। এই ঘণ্টাকৃতি ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী ৬৮ ভাগ এলাকা সাধারণ বুদ্ধির পরিসরে পড়ে, পাশের ১৬ ভাগ সাধারণের উপরে ও ১৬ ভাগ নিচে। সমীক্ষার এই লোকগুলি যদি সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (চক্রভাগ) হয়ে থাকে, আর যন্ত্রটি যদি বৈধ ও নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে পরিসংখ্যানগত এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। এই বক্ররেখার শীর্ষ থেকে যদি মধ্যমাটানা যায়, ভূমির যে বিন্দুতে তা স্পর্শ করবে তা থেকে দু'পাশের বিস্তার—তিন আদর্শ-বিচ্যুতির (স্ট্যানডার্ড ডিভিয়েশন) মধ্যে থাকবে সমস্ত ফল। শতকরা ১৪ জন হল সীমান্তবর্তী স্বল্পবুদ্ধি ও ২ জন বুদ্ধিতে খাটো। অন্যদিকে ১৪ জন বেশী বুদ্ধিমান ও ২ জন অত্যন্ত বেশী বুদ্ধিমান।

নতুন কোন বুদ্ধি মাপা যন্ত্র তৈরি করতে হলে, তাকে এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তবেই সেটা বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রাহ্য হয়। নব-উদ্ভাবিত পরীক্ষার ফলকে

তুল্যমূল্য করে দেখা হয়—স্বীকৃত কোন পরীক্ষা, যেমন—বিনে বা বেক্‌সলারের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে।
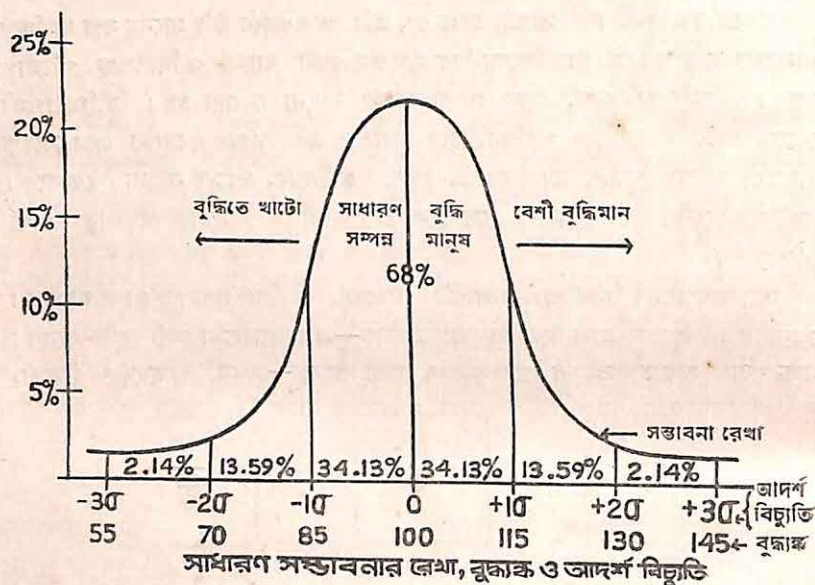
ছবি ৬.৩ :

বুদ্ধি কি

বুদ্ধি মাপার কৌশল ও তার মূল নীতি কি এগুলো যেমন বোঝা গেল—যেটা মাপা হচ্ছে, অর্থাৎ বুদ্ধি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে ধারণাটা একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের সবারই একটা ধারণা আছে। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা কি ভাবেন তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

তাঁদের অনেকেই বলেন, বুদ্ধি হল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা। কেউ বলেন, ব্যক্তির তার সামগ্রিক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। শেখার ক্ষমতা। বস্তু-নিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষমতা। আবার অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে—যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, উদ্দেশ্যমূলক কাজ ও ফলপ্রসূ আচরণ করার ক্ষমতাকেই বলে বুদ্ধি। শেষোক্ত সংজ্ঞাটি মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ডেভিড বেক্‌সলারের। স্টোডার্ডের মতে, বুদ্ধি প্রতিভাত হয় সেই সব কাজে যার আছে সাতটি গুণ (দিক)—দূরূহতা, জটিলতা, বস্তু-নিরপেক্ষতা, সংক্ষিপ্ততা, উদ্দেশ্যমুখীনতা সামাজিক মূল্য ও নিজস্বতা। আবার কেউ বলেন, বুদ্ধি এমন একটা মানসিক ক্রিয়া যার মধ্যে আছে স্মরণশক্তি, জ্ঞান, বিচারবোধ, বিশ্লেষণ-সমীকরণের ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি, ভাষা ও গাণিতিক জ্ঞান, বাস্তববোধ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।

থর্নডাইকের মতে বুদ্ধি তিন প্রকারের—সামাজিক বুদ্ধি, বস্তুবুদ্ধি ও বিমূর্ত বুদ্ধি। প্রথমটি হল অন্য মানুষের সঙ্গে যথাযোগ্য আচরণ করার ক্ষমতা। দ্বিতীয়টি বস্তুজগত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও সেগুলোকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা। আর তৃতীয়টি হল প্রতীক নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা। অবশ্য সমকালীন মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের ১৯২৭ সালে প্রকাশিত বইয়ে এই ধারণার সমর্থন নেই। তিনি মনে করেন প্রত্যেক কাজে মানুষের দু'ধরনের বুদ্ধি প্রকাশ পায়। একটি হল "জি"—অর্থাৎ সাধারণ উপাদান আর একটি বিশেষ উপাদান যা প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন। আবার পরবর্তী কালে থার্স্টোন কমপক্ষে ছটি উপাদানের কথা বলেছেন। খুব সোজাভাবে বললে বলতে হয় বুদ্ধি হল সেই ক্ষমতা যা দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা বা জিনিসের সম্পর্ক বোঝা যায় ও সেটাকে কাজে লাগানো যায়।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে সৃজনশীলতা কি বুদ্ধি? ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন ও গবেষণা কেন্দ্রে ছ'বছর গবেষণা চালিয়ে ম্যাকিসন দেখিয়েছেন, বুদ্ধি আর সৃজনশীলতা এক নয়। সাধারণ অর্থে সৃজনশীল ব্যক্তিরা সবাই বুদ্ধিমান। কিন্তু সব বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৃজনশীল নন। সৃজনশীলতা প্রচলিত বুদ্ধি মাপার যন্ত্রে ধরা পড়ে না। জীবজগতের বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় চেতনার সঙ্গে বুদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। প্রাণীজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার উন্নত মস্তিষ্কের জন্য—যা চেতনা, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতায় ভাস্বর। কিন্তু প্রচলিত বুদ্ধি মাপা যন্ত্রগুলি এই চেতনা সম্পর্কেও আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব।

মানসিক বয়স

ধারণাটা বিনের। পরীক্ষায় সাফল্যের স্তর ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স। পরীক্ষার্থী যে বয়স স্তরের সব কটি দফার ঠিক উত্তর দিতে পারবে বা উল্লিখিত যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবে, সেই বয়স হল তার ভিত্তি বয়স। পরবর্তী বয়স স্তরের প্রশ্নের আংশিক সাফল্য থেকে সে পেতে পারবে আরও কয়েক মাস বাড়তি বয়স। এই দুই-এর যোগফল পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স। যেমন ধরা যাক, একটা ৮ বছরের ছেলেকে পরীক্ষার জন্য নেওয়া হল। তাকে শুরু করতে হবে বিনে-সিমঁর ৬ বছরের প্রথম দফা থেকে। দেখা গেল—সে ৬ বছরের সবকটি দফায় উতরে গেল। অনুরূপভাবে ৭ বছরের প্রশ্নগুলোতেও সে সফল হল। ধরা যাক, পরবর্তী স্তরে ৮ বছরের অর্ধেক ও ৯ বছরের সিকি ভাগে সে সফল হল। ১০/১১-এর কিছু পারল না। এক্ষেত্রে ছেলেটির মানসিক বয়স হবে ঃ

মানসিক বয়স = ভিত্তি বয়স + বাড়তি মাস = ৭ বছর + ৬ মাস + ৩ মাস
= ৭ বছর ৯ মাস

এ থেকে বোঝা গেল যে, ছেলেটির মানসিক বিকাশ তার বয়সের কাছাকাছি। এই একই মানসিক বয়স, যদি একটা ১০ বছরের ছেলের বেলায় পাওয়া যায়, তাহলে

বুঝতে হবে যে তার মানসিক বিকাশ সমবয়সীদের তুলনায় বেশ পেছিয়ে আছে—অর্থাৎ সে কম বুদ্ধিমান। আবার একটা ৭ বছর বয়সী ছেলের যদি ঐ মানসিক বয়স হয় তাহলে সে হবে বেশী বুদ্ধিমান। এখন প্রশ্ন, একই মানসিক বয়স-যুক্ত এই তিনটি ছেলে যাদের বয়স ৭, ৮ ও ১০ বছর, তারা কি সমান বুদ্ধিমান? এটা বোঝার জন্য আর একটু আলোচনা দরকার।

বুদ্ধ্যঙ্ক বা বুদ্ধির ভাগফল

শিশুর শরীর-মনের বিকাশ সমান তালে হবে এটা আদর্শ। সামান্য হেরফের হতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ফারাকটা বেশী হয়ে দাঁড়ায়। বয়সের তুলনার মনের বিকাশ কখনও এগিয়ে বা পেছিয়ে পড়ে। এই পেছিয়ে পড়াটা কখনো এমন যে, শারীরিক ও মানসিক বয়সের ফারাক বাড়তেই থাকে। এই ব্যাপারটাই হল মানস-মন্দন। স্বাভাবিক বুদ্ধিমান শিশুদের যেখানে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মানসিক বিকাশ ঘটে এক্ষেত্রে সেখানে অনেক আগেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন, আগের প্রশ্নে আসা যাক, ভিন্ন বয়সী তিনটি শিশু যাদের মানসিক বয়স সমান, তারা কি সমান বুদ্ধিমান?

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য একটা ধ্রুবকের প্রয়োজন হল। ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট বা সংক্ষেপে আই কিউ কথাটা চালু করেছিলেন ক্যুহলমান ও স্টার্ন ১৯১২ সালে। কিন্তু এটা সঠিকভাবে কাজে লাগল যখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টারম্যানের নির্দেশনায় ইংরেজী ভাষায় বিনে-সিমঁর পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হল। এই বুদ্ধ্যঙ্ক হল বুদ্ধির ভাগফল যার শরীরের বয়স দিয়ে মনের বয়সকে ভাগ করলে যা দাঁড়ায়। সাধারণ শিশুর বেলায় ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মানসিক বিকাশ ঘটে। ১৬ বছরের নিচে ভাজক হয় সত্যিকার বয়স। আর ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে পরীক্ষার্থীর বয়স যাই হোক না কেন, ভাজক সবসময় ১৬ই ধরা হয়। যেহেতু এই অনুপাত কখনো ১-এর কম বা বেশী তাই ভগ্নাংশকে এড়াবার জন্য সংখ্যাটাকে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয়। এই অঙ্কটা এমন একটা ধ্রুবক যা শিশুর ৫ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত তো বটেই, মোটামুটি ভাবে জীবনভোর অপরিবর্তিত থাকে। বেক্‌সলারের পরীক্ষায় অবশ্য সামান্য পরিবর্তন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—বিশেষতঃ মানুষের জীবনের শেষ বয়সে। এখন আগের উদাহরণ তিনটে নেওয়া যাক।

(১) বয়স ৮ বছর মানসিক বয়স ৭ বছর ৯ মাস বা ৭·৭৫ বছর

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{৭·৭৫}{৮} \times ১০০ = ৯৭ \text{ অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি}$$

(২) বয়স ১০ বছর মানসিক বয়স ৭·৭৫ বছর

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{৭·৭৫}{১০} \times ১০০ = ৭৮ \text{ অর্থাৎ বুদ্ধিতে খাটো (প্রান্তিক)}$$

(৩) বয়স ৭ বছর মানসিক বয়স ৭·৭৫ বছর

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{৭·৭৫}{৭} = ১১১$$ অর্থাৎ বেশী বুদ্ধিমান

এখন দেখা যাচ্ছে যদিও ছেলে তিনটের মানসিক বয়স এক, তাঁদেরবুদ্ধ্যঙ্ক আলাদা —অতএব তারা সমান বুদ্ধিমান নয়। সবচেয়ে ছোট ছেলেটা সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ; সবচেয়ে বড় ছেলেটা বুদ্ধিতে খাটো। আর প্রথম ছেলেটার বুদ্ধি সাধারণ সীমার ভেতর। টারম্যান যে সীমান্তর সাজিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী তাকে বলা হবে যার বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯-এর ভেতর। ৯০-এর নীচে বোকা এবং ১০৯ ওপর চালাক।

বেক্সলারের পদ্ধতি চালু হওয়ার পর, আমাদের দেশে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখন ৮৫-র উপর বুদ্ধ্যঙ্ক হলে তাকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। ৭০ থেকে ৮৫ পর্যন্ত যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেয়। সহজে বোঝা যায় না যে এরা বুদ্ধিতে খাটো। স্কুলে গেলে বড় জোর ৬-৭ ক্লাস পর্যন্ত পড়বে। এবং ছোট বয়স থেকে বা বড় হয়ে এরা বেশীর ভাগই গায়ে-গতরে খেটে-খাওয়া মানুষ। ৭০-এর নীচে বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের, তাদের কি বাড়ীতে, কি স্কুলে, কি অন্য সামাজিক পরিবেশে বুদ্ধিতে খাটো বলে সহজেই বোঝা যায়। এদের চালচলন ছোট বাচ্চার মত। বোকা বোকা হাসি। কথা বললে শোনে না। কেউ ভারি ছটফটে। এদের বিদ্যের দৌড় ২ থেকে ৫ ক্লাস। আবার ৫০ এর নীচে যদি বুদ্ধ্যঙ্ক হয় তাহলে দু ক্লাসও যায়

সারণী ঃ ৬.১ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর মানসিক বিকাশের একটা ছক

বয়স	মানসিক বয়স	মানস-মন্দনের পরিমাণ	বুদ্ধ্যঙ্ক	মন্তব্য
(১)	(২)	(১-২)	($\frac{২}{১}$×১০০)	বয়স বাড়ছে। মানসিক
৬ বছর	৪ বছর	২ বছর	৬৭	বিকাশও ঘটছে। কিন্তু
৮ বছর	৫·৪ বছর	২·৬ বছর	৬৭	এক তালে নয়। দুটোর
১০ বছর	৬·৭৫ বছর	৩·২৫ বছর	৬৮	ফারাক ক্রমেই বাড়ছে।
১২ বছর	৮ বছর	৪ বছর	৬৭	অথচ বুদ্ধ্যঙ্ক একই
১৪ বছর	৯·৫ বছর	৪·৫ বছর	৬৮	থাকছে।

না। কথাবার্তাও অস্পষ্ট। ২৫ এর নীচে হলে নিজের জামাকাপড়ও ভাল করে পরতে পারে না। পারে না গুছিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে। কেউ কেউ ভাল করে হাঁটতে চলতেও শেখে না।

এই খাটো বুদ্ধির লোকেরাই হল মানসিক প্রতিবন্ধী।* সাধারণ পরিবেশে এদের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। সম্পূর্ণ বলতে যার পক্ষে যতটা সম্ভব। কি

* এ বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ আছে।

বাড়ীতে, কি স্কুলে এদের প্রতি বেশী নজর দেওয়া দরকার। এদের যতটা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ততটা হওয়ার জন্য চাই বিশেষ যত্ন, বিশেষ পরিচর্যা। প্রয়োজন, সরলীকৃত শিক্ষাক্রম ও সহজ ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এদের বিশেষ শিক্ষালয়ে থাকবে একাধারে চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গে মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করছে প্রায় কুড়িটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রয়োজন আরও বেশি।

বুদ্ধিমাপা যন্ত্রের ব্যবহার

বুদ্ধ্যঙ্ক থেকে ভবিষ্যৎ মানসিক বিকাশ ও সামাজিক নিপুণতা অর্জনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সেইখানেই বুদ্ধিমাপা যন্ত্রের উপযোগিতা। এগুলির প্রয়োগক্ষেত্র হল ঃ

১। **সাধারণ শিক্ষা ঃ** শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ে উন্নত দেশগুলিতে বুদ্ধি পরিমাপ করে রাখা আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সে নিতে পারবে কিনা এবং পারলে কতটা পারছে তা মিলিয়ে দেখা হয়। উচ্চ-শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণেও এগুলির ব্যবহার সর্বজনীন।

২। **মানস-মন্দন ঃ** অনুরূপ কারণে মানস-মন্দিত শিশুদের শ্রেণীবিন্যাস, পাঠক্রম তৈরি ও প্রশিক্ষণে এই সব যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের বেলায়ও এগুলির উপযোগিতা আছে।

৩। **নিযুক্তির ক্ষেত্র ঃ** পাশ্চাত্যে তো বটেই, আমাদের দেশেও বিভিন্ন কাজে লোক নেওয়ার সময় সাক্ষাৎকার ও নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয়। বুদ্ধি পরীক্ষা তার অন্যতম।

৪। **মানসিক রোগ ঃ** কোন কোন মানসিক রোগে দীর্ঘদিন ভোগার ফলে রোগীদের মানসিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। চিকিৎসা, গবেষণা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনে সেগুলি নির্ধারণ করা দরকার হয়ে পড়ে।

৫। **স্নায়ুরোগ ঃ** স্নায়ুরোগ, যথা—মৃগী, সন্ন্যাস ও পক্ষাঘাত ইত্যাদি মস্তিষ্কের রোগে মানুষের উচ্চক্ষমতাগুলি নষ্ট হতে পারে। সেগুলির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এই সব পরীক্ষা দ্বারা। চিকিৎসা, গবেষণা ও পুনর্বাসনের কাজে তা প্রয়োজন।

৬। **গবেষণার কাজে ঃ** স্নায়বিক ও মানসিক রোগে ভোগার আগে ও পরে, চিকিৎসার ফলাফল, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, নতুন জনগোষ্ঠীর বুদ্ধি মাপা, পুরানো যন্ত্রের সংশোধন ও নতুন যন্ত্র তৈরি করার প্রয়োজনে, এগুলির ব্যবহার ব্যাপক।

বয়স বাড়ার সংগে বুদ্ধি বাড়ে, না কমে, এটাও মনোবিজ্ঞানীর একটা কৌতূহলের বিষয়। মধ্য বয়স থেকে যে বুদ্ধি কমতে থাকে সেটা প্রায় অবধারিত (এই

ধারণা থেকেই বিভিন্ন কাজ থেকে অবসর নেওয়ার প্রথা সমাজে প্রচলিত)। কারও ক্ষেত্রে কম, কারও বেশী। এই বুদ্ধিভ্রংশতার সঠিক পরিমাপ সামাজিক কারণেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রচলিত অর্থে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বয়সের পরেও বিভিন্ন পেশায় ও সমাজ-সেবার কাজে লোক নিযুক্ত আছেন, তা আমরা সমাজের সর্বস্তরে দেখতে পাই। এটা কি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়? অথবা অবসর নেওয়ার বয়স সীমাটাই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা?

বুদ্ধিমাপা যন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বুদ্ধিমাপা পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। যেগুলি মূলতঃ প্রযুক্তিগত সেগুলি কাটিয়ে উঠে, পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে এইসব পরিমাপ যন্ত্রগুলি ক্রমশই নিখুঁত হচ্ছে। তাই প্রতিটি যন্ত্রের আছে একটি বিবর্তনের ইতিহাস। এই যন্ত্রগুলির দক্ষ প্রয়োগ সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ এগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে, বিভিন্ন প্রয়োজন ও পটভূমিকার উপযোগী করে নিতে হবে। আবার এদের অপব্যবহার সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।

বহু উপাদানে প্রস্তুত পরীক্ষাগুলিকে অনেকসময় বুদ্ধিমাপা যন্ত্রের চাইতে সেরা বলে মনে করা হয়। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে থার্স্টোন-কৃত প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতা পরীক্ষা ও বেনেটের তৈরি ডি. এ. টি. অথবা মার্কিন শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট সিকিউরিটি ব্যুরোর—জি. এ. টি. বি.। এগুলি বিশেষ প্রয়োজনে প্রস্তুত কিন্তু এর মধ্যেও বুদ্ধি পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানুষের মনের ক্ষমতা যে সম্পূর্ণ বিভাজ্য, কয়েকটি আলাদা উপাদানে প্রস্তুত নয়, তাদের মধ্যে পরস্পরের অধিক্ষেত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি আছে—এ তত্ত্বটি বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া বুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তা বহুলাংশে পরিবেশনির্ভর—সামাজিক বাতাবরণ ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার অস্তিত্ব থাকে কিনা সন্দেহ। শুধু বুদ্ধি মাপা যন্ত্রে কেন—মানসিক পরীক্ষার সবগুলিতেই তাই অটুট বৈজ্ঞানিক মানের হ্রস্বতা রয়েছে। পাশ্চাত্যে মানসিক-পরীক্ষা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের এপথে এখন অনেক দূর যেতে হবে। আমরা আগে কিছু গড়ি। তবে তো সেগুলো ভাঙবো।

যে সব বইএর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। ফ্রাঙ্ক ফ্রীম্যান—সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং, অক্সফোর্ড ও আই. বি. এইচ. পাবলিশিং কোং, কলকাতা, ১৯৬৫।

২। সুভেনির—প্রথম সর্বভারত মানস-মন্দন সম্মেলন, নিউদিল্লী, নভেম্বর ১৯৬৬।

৭ | আত্মমগ্ন শিশু

উদাহরণঃ সন্টু রায়কে যখন আমি প্রথম দেখি ওর বয়স সাত। ভাল জামাকাপড় পরা সুন্দর দেখতে ছেলেটি। স্বাস্থ্য ও মাথায় বয়স অনুযায়ী। সন্টু মেঝের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ভঙ্গীটা অদ্ভুত। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে, একটু কুঁজো হয়ে, কুনুই দুটো বুকের দুপাশে ভাঁজ করে পেঙ্গুইন পাখীর মত সব সময় ডানা নাড়াছিল। চোখের দৃষ্টি সামনের জমিতে। ডাকতে সাড়া দিল না। যা করছিল—করেই চলেছে। গায়ে হাত দিতে কেমন সিটিয়ে গেল। কথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ একপলক আমাকে দেখে নিয়েই আবার পূর্ববৎ। নাম জিজ্ঞেস করেছি বোধহয় বার দশেক। তখন বলেনি। এখন হঠাৎ বলে উঠল, সন্টু রায়, সন্টু রায়, সন্টু রায়…। গলার স্বর তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং কেমন যেন যান্ত্রিক। যেন পরিচয় করার ইচ্ছা থেকে এ কথাটার জন্ম নয়। নেহাৎ বলতে হয় বলেই বলা কিংবা কেন যে বলছে তা জানে না। মেঝেয় বসে ছিলেন ছোট ডেস্কে ৩/৪ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে একজন দিদিমণি। সন্টু হঠাৎ হাঁটতে লাগল। ঠিক হাঁটা নয়—দৌড়ানো। সামনের বাক্স, খাতা-কলম সবের উপর দিয়ে সে ওপাশে ছুটে গেল, ঘুরতে লাগল—সামনের মানুষজন, জিনিসপত্র যেন কেউ নেই, কিছু নেই। দৃষ্টি শূন্য—ফাঁকা—শুধু দেখা গেল সে ওপাশের দেওয়ালে ধাক্কা খেল না। ঘুরে এল। আর ঘুরতেই লাগল। সবাই হয়রান হয়ে গেল ওকে থামাতে।

রোগটা কেমনঃ আটিজম্ শিশুদের এক দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি। এতে যারা ভোগে তাদের বলে অটিস্টিক শিশু। অটস্—গ্রীক কথাটার মানে হল নিজে বা স্বয়ং। নিজেতে নিজে নিমগ্ন বা আত্মমগ্নতা এ রোগের মূল কথা। লিও কানার এ বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অটিস্টিক শিশুদের প্রধান লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে গেছেন।

দেখা গেছে মিশ্র এক মানসিক প্রতিবন্ধীদের দলে এদের সংখ্যা শতকরা দশ। এরা কিন্তু সকলে অল্পবুদ্ধি নয়। ভাষা-নির্ভর বুদ্ধিমাপা পদ্ধতিতে বিচার করলে এদের সকলেই খাটো বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু অমৌখিক পরীক্ষায় এদের ক্লীতত্ব (ব্যাধির লঘুতর অবস্থায়) সাধারণ শিশুর মতই—অল্পবুদ্ধি থেকে অতিবুদ্ধিমান সবাই আছে এদের দলে। তবে হ্যাঁ, এরকম চারজন শিশুর তিনজনের মানসিক বিকাশে ন্যূনতা থেকে যায়।

এ এক বিচিত্র ব্যাধি। এ রোগে আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক লক্ষণ কিছু নেই। আকার বৃদ্ধি সব ঠিক আছে। ব্যবহারিক বৈচিত্র্যে এদের ধরতে হয়। এরা ঠিক

বাউলবি বা স্পিৎজ উল্লিখিত মাতৃ-বিচ্ছিন্নতার দরুন শিশুরা যে বিষণ্ণতা-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তার মত নয়। আবার ন্যূনবুদ্ধি শিশু, যেমন—ক্রেটিন বা মঙ্গোল তাদের মতও নয়। প্রথম শিশুগুলি মা থেকে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিল হাসিখুশী, প্রাণচঞ্চল। আর শেষোক্ত শিশুদের শারীরিক লক্ষণ স্পষ্ট
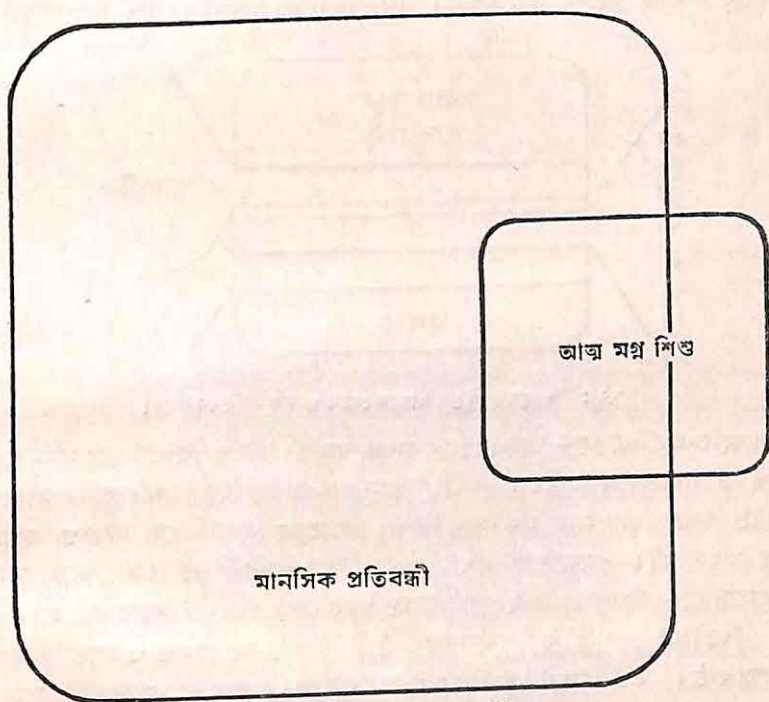
মানসিক প্রতিবন্ধী ও আত্ম মগ্ন শিশু

ছবি ৭'১ :

ও আচরণ তাদের চেয়ে ছোট শিশুর মত। এদের কখনই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলা যাবে না। কোন ক্ষেত্রে মিল থাকলেও—যেমন কথা বলার অপারঙ্গমতা—অটিস্টিক শিশুর ব্যবহার এদের থেকে একেবারে ভিন্ন। তাদের আচরণ উদ্ভট ও বোঝা যায় না। আরও মুস্কিল হল, কখনো এই রোগের সংগে মিশে থাকে মস্তিষ্কের ব্যাধি—মৃগী, সেরিব্রাল পলসি বা মস্তিষ্কের কিংবা তার ঝিল্লির অতীত প্রদাহের ঘটনা। কারো কানে শোনা ও দেখার ত্রুটি থাকে। সেক্ষেত্রে অবস্থা আরও গুরুতর।

শুরু ও প্রকাশ : রোগের শুরু কারু বেলায় জন্মক্ষণ থেকেই। কেউ তিন চার বছর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার পর এই রোগের কবলে পড়ে। এমনকি অটিস্টিক শিশুদের মার গর্ভকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে বেশী গণ্ডগোল ও জটিলতার ঘটনা পাওয়া গেছে। বেশী বয়সে আক্রান্ত হলে বা শিশুকে বেশী বয়সে দেখলে অটিজমের

সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি সব সময় পাওয়া যায় না। ব্যাধির গুরুত্ব সকলের সমান নয়। তাই ব্যাপারটা চট করে ধরা যায় না। যায় না কারণ, শিশু মূলতঃ আত্ম-সর্বস্ব। নিজের প্রয়োজনটুকু সাধিত হলে নিশ্চিন্ত—অন্ততঃ গোড়ার দিকে। প্রাধান্য থাকে আন্তর-উদ্দীপকের। ক্রমে বাইরের উদ্দীপক, ইন্দ্রিয়-সংবেদনা ও অনুভূতির প্রভাবে কিশলয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। তারপর শিক্ষা চলছেই। উদ্দীপক-সংবেদনা-
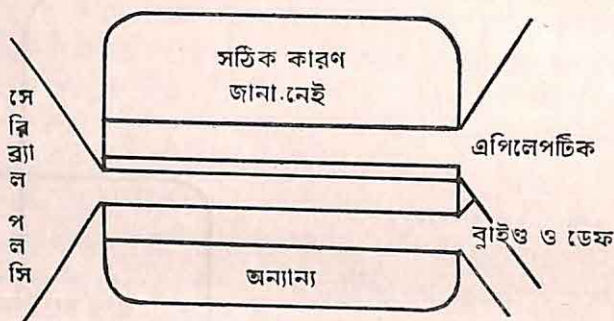
৭.২ : আত্মমগ্ন শিশুর মাথার রোগ ও অন্য প্রতিবন্ধকতা।

অনুভূতি-অর্থ এই চক্র—তারপর গ্রহণ অথবা বর্জন। আনন্দ গ্রহণকে করে সুনিশ্চিত, কষ্ট শেখায় বর্জন করতে। অর্থাৎ (প্রাকৃতিক ও মানবিক) পরিবেশের সংঘাতে আস্তে আস্তে তার সামাজিকীকরণ ঘটে। সুতরাং কখনো সে আত্মমগ্ন, কখনো সে বহির্মুখী। আত্মমগ্নতা কখন অস্বাভাবিক—তার অনড় কোন সূত্র নেই। সমবয়সীদের গড়পড়তা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ এই বিচার করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সে শারীরিক দিকে আর পাঁচটা শিশুর মত দেখতে ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। তাই কিছুটা দেরী হয়েই যায় বুঝতে। তবে মা, কয়েকমাস যেতে না যেতে বুঝতে পারেন—সব যেন ঠিক নেই। অবশ্য শিশুটি প্রথম সন্তান হলে অনভিজ্ঞ মার বুঝতে বুঝি মাস পেরিয়ে বছর ঘুরে যায়। ধ্বক করে প্রথমে মার বুকে যেটা লাগে সেটা হল—বাচ্চাটা তার দিকে তাকিয়ে হাসে না, হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলে আগ বাড়িয়ে আসে না।* কেমন নির্জীব, নির্জীব। শান্ত শিষ্ট। বড় সংসারে কর্মীণি মার পক্ষে ভাল। কোন ঝামেলা নেই। পেট ভরে খাইয়ে দিলে হল। আপন মনে খেলবে। কিংবা খিদে পেলেও তেমন চেঁচায় না। বাছা বড় লক্ষ্মী। যে মার মন ও অবসর বেশী—তার কিন্তু সময় কাটে না। ছেলের দিকে মনোযোগ অথচ ছেলে তার আদরে সাড়া দেয় না; তার গলার স্বরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় না, তার ছড়া কবিতায় সে খিলখিল করে হাসে না। অথবা ঘর ছেড়ে চলে গেলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে না। কখনো আবার বিনা কারণে এমন কাঁদে, ভোলানো যায় না। এ কেমনতর ছেলেরে বাবা!

* দ্রষ্টব্য: শিশুর প্রথম পাঁচ বছর।

সব সময় হাতটা নেড়ে খেলা আর সেই দিকে তাকিয়ে থাকা। কোন তাপ-উত্তাপ নেই। উঠে বসেছে ঠিক ছ'মাসে কিন্তু আরও ছ'মাস কেটে গেল—দাঁত বেরুল অথচ দাঁড়াতে পারল না, মুখে বোল ফুটল না। ডাকলে সাড়া দেয় না। কানে কি কম শোনে? ওরকম করে কোথায় তাকিয়ে থাকে—চোখে কি ঠিক দেখে না? কত প্রশ্ন মার বুকে তুফান তোলে। অবশেষে টনক নড়ে। সবাই ব্যস্ত হয়। শুরু হয় অন্তহীন ছোটাছুটি। চলো ডাক্তারের কাছে। ছ'মাস, এক বছর। কই সারলো না তো! ডাক্তারের পর কবিরাজ, হোমিও, হাকিম। অথবা মাদুলি, তাবিজ, জলপড়া, তন্ত্রমন্ত্র। কিছুতেই কিছু হয় না। হঠাৎ দেখা গেল ছেলে দৌড়াচ্ছে। আরে, ও হাঁটতে শিখল কবে? কথা যে বোঝে না; তাতো নয়। বেশ বোঝে। শোনে না। কান দিয়ে হয়তো শোনে—মন দিয়ে শোনে না। কিংবা শোনে কিন্তু মানে না। মান্য করার প্রয়োজন মনে করে না। একি ধাঁধা? শুধু কি তাই? আরও আছে।

ছবি ৭.৩ : আত্মমগ্ন শিশু। বয়স আট। চোখের দিকে তাকায় না।

এ কেমনতর সাড়া : ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পর্কে এদের গণ্ডগোল থাকে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হলে সাধারণ শিশু চমকে ওঠে। এরা কিন্তু নির্বিকার। আবার অতি সামান্য আওয়াজে এরা হঠাৎ ভয়চকিত বিহ্বল হয়ে পড়ে (যেমন টিকটিকির শব্দে)। ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি। দেখার মত করে কিছু দেখে না, দেখতে চায় না। চোখের দিকে

তাকায় না। তাকালেও পলকের জন্য। আবার অতি সামান্য কিছু—ধুলো বা কাঁকর অথবা নিজের আঙুল চোখের অতি কাছে এনে গভীর ভাবে কি যে নিরীক্ষণ করে—ওই জানে। খেলনা দিলে নেয় না, ছবি-বই ঠেলে দেয়, এড়িয়ে যায়। অথচ একটা লাট্টু দাও ঘুরিয়ে, দেখবে কেমন আত্মহারা হয়ে ওঠে। আদর কর, জড়িয়ে ধর। জড়সড় হয়ে যায়। না হয়, সরিয়ে দেয়, ছাড়িয়ে নেয়। তবে হ্যাঁ, কাতুকুতু দাও—অপছন্দ করে না। নখ দিয়ে বিছানার চাদর খোঁটে, হাত ঘষে—মনে হয় সেই মৃদু আওয়াজ ও স্পর্শ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।

মানুষ করা ঃ দুশ্চিন্তার বড় কারণ ওদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা মুস্কিল। ওদের শরীরের বাড় আছে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় ওরা সাধারণ সুস্থ শিশু অথচ আচরণে নিজের ক্ষতি ও অপরের বিরক্তির কারণ হয়। সাধারণ শিশুদের দেখা যায়, অন্য লোকের সামনে বা নতুন জায়গায় একটু ভীতু ভীতু হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা নতুন জায়গা হলে যদিও বা ভয় পায় নতুন লোক সম্বন্ধে নির্বিকার। তার যা করার সে করতে থাকে। কেউ পায়ের পাতায় ভর করে ঘুরপাক খায়, কেউ একটা খেলনা নিয়ে ঘোরাতে বা কামড়াতে থাকে, কেউ বা হাত, পা বা সারা শরীর নাড়াতে থাকে। বা বসে বসে দোলে। বড় ছেলে—বাবামার সংগে বেরিয়ে দোকান থেকে হঠাৎ জিনিস তুলে নেয়, বেমক্কা কথা বলে ফেলে। অন্য লোকে ভাবে বাবা-মা আদর দিয়ে মাথা খেয়েছে। অথচ বাবা-মা জানেন—যে ওদের দুষ্টুমি হাজার চেষ্টা করেও বন্ধ করা যায়নি। কারো সংগে সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আবেগের ধারগুলো ভোঁতা। তবে ভীতু ভীতু আড়ষ্ট ভাব থাকে চলা ফেরায়। অথবা নির্বিকার—আনমনা।

৭.৪ ঃ আত্মমগ্ন শিশুর বৈশিষ্ট্য।

অটিস্টিক শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা মুস্কিল, কারণ সে ইশারা বা কথা, কোনটাই বোঝে না বা বুঝতে চায় না। কথা ফোটার আগে অন্য সব শিশুর মার সঙ্গে একটা প্রাথমিক ভাষা থাকে—যা দিয়ে তারা পরস্পরকে বোঝে ও চালায়। মার সংকেত—কখনো মৃদু আওয়াজ, ঘাড় নাড়া বা চোখ পাকানো—এই সব থেকে সাধারণ শিশু বোঝে তার কোন্ ব্যবহার অনুমোদন করা হচ্ছে আর কোন্‌টা বা অপছন্দের। বোঝে,

কোথায় কোন্ ব্যবহার করতে হবে। তাই কোন কিছু করতে করতে সে মার মুখের দিকে তাকায়। শুধু মার কেন, অন্য লোকের হাবভাব থেকে সে বুঝতে পারে অন্যরা কি ভাবছে, বা তার প্রতি মনোভাব কেমন। কিন্তু আত্মমগ্ন শিশুরা এই সব সংকেত ধরতে পারে না। ফলে তার সামাজিক শিক্ষা—কথা বলতে শেখা ব্যাহত হয়। কখনো দেখা যায় সে সামান্য কারণে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কান্নাকাটি, চঞ্চলতা, লাফালাফি করতেই থাকে। সাধারণ বাচ্চার মত তাকে বাগে আনা যায় না। আদর, ইশারা, কথা কোনটাই কাজে লাগে না।

ছবি ৭.৫ : আত্মমগ্ন শিশু। বয়স চার বছর। উদ্ভট ভঙ্গী।

শিক্ষা : ভাষা শেখার ঘাটতি আত্মমগ্ন শিশুর মানসিক বিকাশের একটা মস্তবড় অন্তরায়। তার লেখাপড়া বা সামাজিক শিক্ষা কোনটাই ঠিকমত হয় না। বয়স

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কথা সে বলে বটে কিন্তু তার কথাবার্তা অনেকটা তোতাপাখীর মত। তাকে কেউ কিছু বললে—সে সেই কথাটাই ঘুরিয়ে বলে। অথবা প্রশ্নের উত্তরটা বার বার বলে। স্বর কেমন খ্যানখেনে। অথবা যান্ত্রিক উচ্চারণ —তাতে যেন প্রাণের পরশ নেই। তার শেখার গতিপ্রকৃতি কেমন এলোমেলো। লিখতে পারলে পড়তে পারে না, আবার পড়তে পারলে হয়ত লিখতে পারে না। এমনি করে তার স্কুলে ঢোকার বয়স পেরিয়ে যায়।

কেউ কেউ অবশ্য স্কুলে যায়। কিছুটা পড়েও। কারু কারু দেখা যায় বিশেষ ক্ষমতা—যেমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। দশটা অঙ্কের রাশি একবার শুনে বলে দিতে পারে। অথচ অন্যদিকে হাঁদা। কেউ সাল, তারিখ, বার সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয় ঝট্ করে—(যেমন, ১৯৮১ সালের ২৩ জুলাই কি বার ছিল) কিন্তু হিসাব করে দেখাতে পারে না। গান-বাজনা সম্পর্কে আগ্রহ থাকে কারো। কারো ঝোঁক আঁকার দিকে। বিষয় ও রঙের ব্যবহারে থাকে অপূর্ব বৈচিত্র্য। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায়, কাজকর্ম করেন এমন কয়েকজনকে পাওয়া গেছে যারা অতীতে ছিলেন অটিস্টিক শিশু। সুতরাং অটিজম্ মানে কানাগলি নয়।

শেষ কথা ঃ গোড়ায় ধরতে পারলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা-শিক্ষা-প্রশিক্ষণে এরা অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। অটিজম্ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামাজিকীকরণের। শিশু-চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, বিশেষ শিক্ষাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছেন—স্নায়ুবিদ, জীবরাসায়নিক ও শারীরতাত্ত্বিকগণ—এই ব্যাধি সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করার জন্য ও নতুন পথের খোঁজে। এরকম বিজ্ঞানীদের মিছিলে যে নামটি অধুনা সংযোজিত হয়েছে—তিনি ১৯৭৩-এর নোবেল-পুরস্কার জয়ী টিনবারজেন।

নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ছাড়া যে প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে : ই. এম. অরনিৎজ : চাইল্ডহুড অটিজম্—এ রিভিউ অব ক্লিনিক্যাল অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেন্টাল লিটারেচার। ক্যালিফ. মেড. ১১৮ : ২১-৪৭ : এপ্রিল ১৯৭৩।

৮ | প্রতিবন্ধী বছরের ভাবনা

১৯৮১ সাল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসর। মন্দক্ষম ব্যক্তিদের কল্যাণে এই বৎসরটি বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই নানা কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতে জাতীয় পর্যায়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক এ সমস্ত পরিকল্পনার নীতি নির্ধারক। তাদের উদ্যোগে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও আইন মন্ত্রকের সমবেত প্রচেষ্টায় তা রূপ নিতে চলেছে। অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গেও সমাজ কল্যাণ দপ্তর এবিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে। এ বছর ৪ ঠা জানুয়ারী, রবীন্দ্র সরোবরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সরকারী ও বেসরকারী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করে আসছেন। তাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে যে কাজ চলছে তাতে সমস্যাটির সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অথচ সমস্যাটির সামগ্রিক চিত্র সম্বন্ধে ধ্যানধারণা না থাকলে জাতীয় পর্যায়ে বা রাজ্য পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে বা কল্যাণকর আয়োজনে নানা ত্রুটি থেকে যাবে। তাই প্রথমেই একটি তালিকা প্রস্তুত প্রয়োজন যাতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সামগ্রিক বিবরণ থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। পুনরাবৃত্তির বদলে তাদের পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে।

৮.১ : প্রতিবন্ধী কল্যাণ ব্যবস্থা।

বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য আছে চারটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এগুলি হলঃ ১। দৃষ্টিহীনতা বা চোখে-না-দেখার অসুবিধায় যারা ভুগছেন তাদের জন্য একটি, ২। যারা কানে শোনেন না বা আংশিক শোনেন এবং কথা বলতে পারেন না বা বলার ত্রুটি আছে তাদের জন্য একটি, ৩। যারা খঞ্জ, পঙ্গু অঙ্গহীন বা যাদের হাত-পায়ের অক্ষমতা বা বিকৃতি আছে এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি এবং ৪। যারা মানসিক পঙ্গু বা অল্প বুদ্ধি তাদের জন্য একটি। এই চারটির মধ্যে তৃতীয়টি স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতার উত্তরে বি. টি. রোডের ধারে ভারতীয় শারীরবিজ্ঞান সমিতি ও পরীক্ষামূলক ভেষজ সমিতি
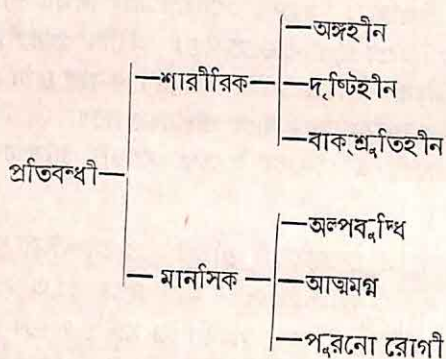
৮.২ঃ প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিভাগ।

যেখানে বনহুগলী পুনর্বাসন কেন্দ্র ও হাসপাতালসমূহ স্থাপন করেছিলেন, অধিগৃহীত সেই বাড়ীগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে এই সংস্থাটি—যার প্রচালক নিয়োগ করা হয়েছে একজন অস্থিশল্যবিদ্‌কে। এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াও গমন সহায়ক যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্তুত করা হবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ—যাদের এই সব পরিসেবার প্রয়োজন তারা কি করে এইসব কেন্দ্রে আসবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সরকারী নির্দেশ এখনও অপেক্ষিত। সুতরাং এই ধরনের কেন্দ্রের বা উপকেন্দ্রের প্রয়োজন হবে প্রতি রাজ্যেই এবং তা তাদের রাজধানী বা প্রধান শহরের কাছাকাছি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার একজন সঙ্গীর যাতায়াত খরচ বহন করতে হবে রাষ্ট্রকে অথবা কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে।

সতিাই কি আমরা প্রতি রাজ্যেই এই রকম চারটে করে কেন্দ্র বা মূল কেন্দ্রের অধীন কিছু উপকেন্দ্র স্থাপন করব? এ প্রশ্নের উত্তরে জানতে হবে—সমস্যাটির ব্যাপকতা কত এবং তা কতখানি আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আঘাত হানছে। এবং এর সংগে মানবিক প্রশ্নই বা কতটা জড়িত আছে? আরও মূল

প্রশ্ন—প্রতিবন্ধী আমরা কাদের বলব ? দুর্ঘটনা, কর্কট রোগ, কুষ্ঠ রোগে কারো কারো অঙ্গ বা উপাঙ্গের হানি হয় বা জীবনের প্রয়োজনে কিছু বাদ দিতে হয়—তারাও কি প্রতিবন্ধী ? যারা দীর্ঘ দিন মানসিক রোগে বা স্নায়বিক রোগে (যথা—মৃগী) ভুগে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না তারা কি প্রতিবন্ধী নন ? সুতরাং প্রথমেই চাই একটি সংজ্ঞা। প্রতিবন্ধী বা মন্দক্ষম এই কথাটির সঠিক রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। এবং তা করতে হলে চাই একটি বিশেষজ্ঞ দল—যে দলে অন্ততঃ থাকবেন : ১। চক্ষু বিশারদ, ২। শ্রুতি বিশেষজ্ঞ, ৩। অস্থিশল্যবিদ্ ও ৪। স্নায়ুবিদ্ ও ৫। মনোবিজ্ঞানী। প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত প্রতিটি সংজ্ঞা নিরূপণ করবেন তাঁরা। কোন ব্যক্তিকে মন্দক্ষম বা প্রতিবন্ধী বলা হবে কিনা সে সম্বন্ধে রায় দেবেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞগণ। চিকিৎসা, যতটা সম্ভব করার পরই, "মন্দক্ষম" এই সংজ্ঞা ব্যবহৃত হবে এবং চিকিৎসোত্তর পুনর্বাসন—যথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের আওতায় তাকে আনতে হবে।

৮.৩ : প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থার কর্মীবাহিনী।
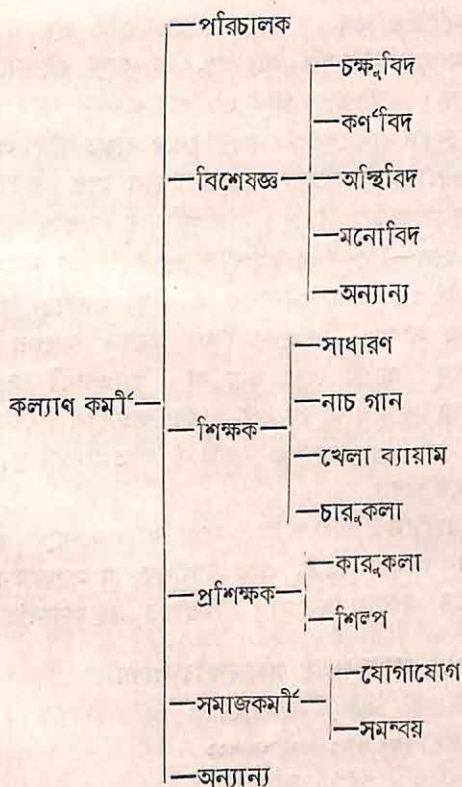
জনসংখ্যার কতভাগ প্রতিবন্ধী—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে তাই প্রথমেই ঠিক করতে হবে সংজ্ঞাগুলি। জাতিপুঞ্জের প্রতিবেদন বলে, সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০ কোটি প্রতিবন্ধী আছেন এবং তাদের বেশীর ভাগ বাস করেন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। সংখ্যাটিকে আপাতদৃষ্টে স্ফীত মনে হয়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে রোগোত্তীর্ণ যক্ষ্মারোগী, হৃদ্‌রোগী, স্নায়ুরোগী, কুষ্ঠরোগী ও কর্কট রোগীদের ধরা হয়েছে। এবং তার সংগে আছে অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের সংখ্যা। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নভাবে সীমিত যে সব সমীক্ষা চালান হয়েছে ও বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মিল নেই। চলন-সই পরিসংখ্যান একটা এখানে দেওয়া হল ঃ

১। দৃষ্টিহীনতা ঃ ১০,০০০০০ দশ লক্ষ
২। শ্রবণহীনতা ঃ ২,০০০০০ দু লক্ষ
৩। পঙ্গুতা ঃ ৫,০০০০০ পাঁচ লক্ষ
৪। মানস-মন্দন ঃ ২০,০০০০০ বিশ লক্ষ

মোট ৩০,০০,০০০ সাঁইত্রিশ লক্ষ। অর্থাৎ ভারতে প্রতি দুশ জনে একজন প্রতিবন্ধী। সামান্য ও মাঝারি খুঁত যদি ধরা হয়, তা হলে এই সংখ্যাটা হবে চারগুণ—অর্থাৎ দেড় কোটি। তার মানে প্রতি ৫০ জনে একজন করে প্রতিবন্ধী। জাতি এবং দেশ এই দেড় কোটি মানুষের কর্মক্ষমতা থেকে বঞ্চিত কারণ এদের বেশীর ভাগই চিকিৎসা-শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটায়। সমাজের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কি পরিমাণ জাতীয় অপচয় ঘটছে তার সম্যক পরিচয় পেতে হলে—বিশেষ ভাবে প্রণীত প্রশ্নাবলী দ্বারা নমুনা সমীক্ষা চালানো দরকার। এগুলি হবে এলাকা-ভিত্তিক ও রাজ্য সরকারগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে ত্বরায় একাজ সারতে। দুঃখের বিষয় অন্যান্য কাজের তুলনায় এ ব্যাপারে কর্তাব্যক্তিদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কি ধরনের এবং কতগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আমাদের দরকার তা ঠিক করা উচিত হবে ও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে, প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে হবে।

সাম্প্রতিক আদমসুমারীতে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ, বোবা ও পঙ্গু তাদের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, এতে আংশিক বা সন্দেহজনক অবস্থার জন্য কোন সংবাদ সংগ্রহের অবকাশ ছিল না। দ্বিতীয়ত এই অনুসন্ধানে মানসিক

১৯৮১ লোকগণনায় প্রতিবন্ধীর সংখ্যা

অন্ধ ঃ	৪, ৭৮, ৬৫৭
মূকবধির ঃ	২, ৭৬, ৬১১
খঞ্জ ঃ	৩, ৬৩, ৬০০
মোট ঃ	১১, ১৮, ৮৬৮

প্রতিবন্ধীদের কথা বলা হয়নি—অথচ সংখ্যার দিক দিয়ে তারা বাকী তিনটির মোট সংখ্যার চাইতে বেশী, এবং অক্ষমতা ও অসহায়তার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা সবার চেয়ে নীচে। চোখ, কান, হাত-পা ঠিক থাকলেও মানুষ যে কত অক্ষম ও অসহায় হতে পারে—যারা মানস-মন্দিতদের দেখেছেন তারা জানেন। সরকার নিজে অথবা কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আঞ্চলিক নমুনা সমীক্ষা করিয়ে এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

এমন সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায় যে সক্ষম নাগরিকদের যেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ নেই সেখানে মন্দক্ষমদের কথা ভাবা বিলাসিতা। এ যুক্তি ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে সমস্ত রাষ্ট্রেই বেশীর ভাগ আয়োজন সক্ষম ও স্বাভাবিক নাগরিকদের কথা ভেবে করা হয়। প্রতিবন্ধীদের সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার অন্তরায় আছে বলেই তাদের জন্য চাই বিশেষ ব্যবস্থা। মানবিক দায়ে ও সাংবিধানিক ভাবে সমস্ত নাগরিকদের উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি-বন্ধ। ভারতের দেড় কোটী মানুষের কাছে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধ করব যদি সেই সব ব্যবস্থা না করি। প্রতিবন্ধীরা নিজস্ব অধিকারেই সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এটা কোন দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়।

সম্প্রতি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ শিক্ষালয়ে লেখাপড়া বা কাজকর্ম শেখানোর কথা বলা হচ্ছে যাতে তারা সুসমভাবে গৃহীত হয়। কারণ পৃথক বিদ্যালয় ব্যয়বহুল—ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় দুভাবেই। এ ছাড়া পৃথকীকরণে গোড়া থেকেই তাকে ছাপ মেরে দেওয়া হয়। এর ফলে পরজীবনে অপ্রতিবন্ধীদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে তাদের অনেক অসুবিধা হতে পারে। শৈশব ও বাল্যে তারা অন্যান্য সাধারণ ছেলেদের সংগে মিলে মিশে বড় হবে এটাই স্বাভাবিক এবং তাই হওয়া উচিত। হীনমন্যতা জন্মালেও তা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। সাধারণ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অনুপাতের আদর্শ হিসেবে বলা হয়—প্রতি দশজনে একজন। ৩০-৫০ জনের প্রতি শ্রেণীতে তিনজন করে প্রতিবন্ধী নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের এদের সহজভাবে নিতে শেখাতে হবে। এই সব বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের প্রয়োজনে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। যেমন সিঁড়ির বদলে ঢালু পথ—যাতে চাকাচেয়ার চলতে পারে অথবা শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রযুক্ত শিশুদের শিক্ষকের যথা-সম্ভব কাছে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবুও কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থেকেই যাবে। যেমন দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য চাই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা। অথবা বাক্-শ্রুতির ত্রুটিতে যারা ভুগছেন তাদের চিকিৎসায়, কথা শেখানো একটা প্রধান অঙ্গ। এ শিক্ষা হবে মাতৃভাষায়। এটাই বাঞ্ছনীয়। তাই বাক্-শ্রুতি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি হবে ভাষাকেন্দ্রিক—প্রতিটি ভাষায় একটি করে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধেও এই সূত্রটি মনে রাখতে হবে। তাকে যা কিছু শেখান হবে তা হবে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দিল্লীতে ভারত সরকারের একটি কেন্দ্র আছে মানস-মন্দিত শিশুদের জন্য। এখানে অপেক্ষাকৃত উঁচু বুদ্ধ্যঙ্কের এবং যাদের কোন শারীরিক খুঁত নেই তেমন শিশুদের নেওয়া হয়। ৫০-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, তাদের জন্য ব্যবস্থা নেই—অথচ অসহায়তায় এরা তুলনাহীন। এদের কেউ কেউ ঠিকমত হাঁটতে চলতে পারে না, পারে না কথা বলতে, বা আপন হাতে খেতে পরতে। এদের আগলে রাখার জন্য, খেলাধুলা, সামান্য পড়া লেখা, কাজকর্ম দিয়ে যতটা বিকাশ সম্ভব তা করার জন্যে, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। একটি মানস-মন্দিত শিশু
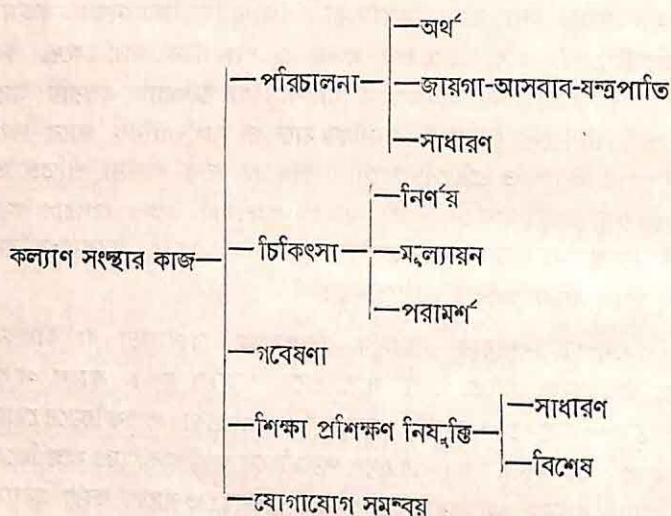
৮.৪ : প্রতিবন্ধী কল্যাণসংস্থার কাজের ধারা।

কোন পরিবারে থাকলে এবং সে যদি আবার নিম্ন বুদ্ধ্যঙ্কের হয়—তাহলে তাদের উপর যে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ পড়ে তা ভুক্তভোগী পরিবারই জানেন। শুধু যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কার্যক্ষমতা থেকে পরিবার বঞ্চিত হল তাই নয়, অন্যদেরও সামাজিক সৃজন ক্ষমতা ব্যাহত হয়—কারণ তাদের ব্যস্ত থাকতে হয় ও সময় দিতে হয় ঐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটিকে নিয়ে। তাদের মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যাবে এবং দেশ ও সমাজ তাদের সৃজনশীলতার সবটাই পাবে—যদি এই শিশু বা ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া হয়। সে দায়িত্ব রাষ্ট্রই নিতে পারে – কারণ দায়িত্ব পর্বতপ্রমাণ ও আইনগত সমস্যা এর সংগে জড়িত। অত্যন্ত দুঃখের কথা—মানসিক প্রতিবন্ধীদের "ভারতীয় উন্মাদ আইনের" আওতায় বিবেচনা করা হয়—যদিও তারা উন্মাদ নয়। এটা ঠিক যে বয়ঃপ্রাপ্তির পরও তাদের তত্ত্বাবধায়ক দরকার থাকে। কিন্তু কারুকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে হলে, বা তার করা কোন কাজ (যথা বিবাহ, সম্পত্তি হস্তান্তর) নাকচ করতে হলে তাকে অবশ্যই

"অসুস্থ মানসিকতা"-যুক্ত ব্যক্তি বলে আদালতে প্রমাণ করতে হবে। তারপর সন্তুষ্টি-সাপেক্ষে আদালত সেইমত ঘোষণা করবেন ও ব্যবস্থা নেবেন। এ অবস্থার অবসান চাই—তাদের জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।
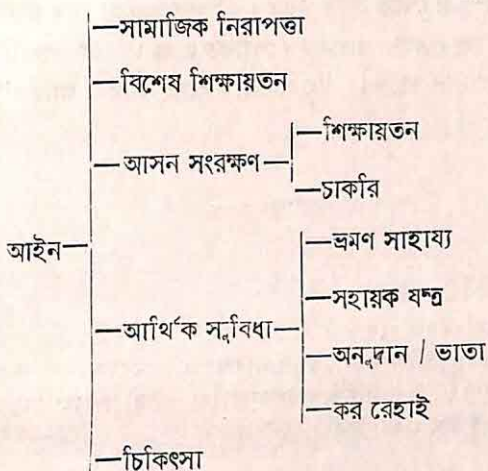
৮.৫ : প্রতিবন্ধী কল্যাণে যে সব আইন দরকার।

সমাজ-কল্যাণের কাজ কর্ণাটক প্রদেশে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী নয়—সামাজিক দিক দিয়ে যারা উপেক্ষিত ছিল, তাদের জন্য নানারকম কল্যাণকর কাজকর্ম হাতে নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্তরে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রককে ঢেলে সাজিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রক গড়ে তোলা দরকার। এই মন্ত্রক শুধু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা ভাববে না—তাদের কাজের আওতায় আসবে বৃদ্ধ, অসহায়, আতুর, গৃহহীন, ভিখারী, বারবনিতা, অথবা সামাজিকভাবে অবক্ষয়িত বা অবহেলিত শ্রেণী। মেয়াদ উত্তীর্ণ কয়েদী ও পুরনো মানসিক রোগীদেরও এই মন্ত্রকের অধীনে আনতে হবে।

উপসংহারে বলি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা প্রণয়ন করা ও তাদের উপর কিছুটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক নিরাপত্তা (বর্তমানে সমাজ কল্যাণ) দপ্তর / মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবেই তারা সরকারী অনুদান বা বেসরকারী দান গ্রহণ করতে পারবেন। সরকারী পরিদর্শক মাঝে মাঝে এই সংস্থাগুলির কাজকর্ম তদারক করবেন ও দরকার মত উন্নয়নের সুপারিশ, পরামর্শ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

সমাজ কল্যাণের নামে যেন ব্যক্তিস্বার্থের পোষণ না হয় সে দিকে নজর রাখা দরকার। সেদিন দেখলাম, ট্রেনে একটা ছোট অন্ধ মেয়েকে নিয়ে এক বিধবা মহিলা ভিক্ষা করাচ্ছেন। মহিলা বাচ্চাটির কাঁধ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আর সে

বিকৃত গলায়, "বাবা একটা পয়সা—দিন না বাবা" বলছে। দেখলাম, ভালই পয়সা পড়ছে। ভাবলাম কে কাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে? মহিলাটির খেটে খেতে হচ্ছে না। আর ছোট মেয়েটি ওর সাহায্য ছাড়া বাইরে আসতে পারত না—এত পয়সা পেত না—না খেতে পেয়ে মরত। কিন্তু আমার যেন মনে হল মহিলাটিই বেশী সুবিধা নিচ্ছেন এবং বাচ্চাটি শোষিত হচ্ছে। এই কথাটি যেন প্রতিটি সমাজকল্যাণ কর্মীর মনে থাকে। "ওরা আছে বলেই আমরা আছি।"

যে সব প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। বি. চক্রবর্তী: ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জারনাল: ডিসেম্বর ১৯৮০, কলকাতা।

২। এম. ভি. সিং: ডিসএ্যাডভানটেজড চাইল্ড; দিল্লী অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টস্, ১৯৮০, দিল্লী।

প্রতিবন্ধী কল্যাণব্রতী পশ্চিমবঙ্গের সংস্থাগুলির নাম ও ঠিকানা

১। ন্যাশন্যাল ইন্সষ্টিটিউট ফর অরথোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড। (ভারত সরকার—সমাজকল্যাণ মন্ত্রক) বনহুগলী, কলকাতা-৩৫।

২। ভোকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড (শ্রম মন্ত্রক, ভারত সরকার) ৩৮, বদন রায় লেন, কলকাতা-১০।

৩। রুরাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড (শ্রম মন্ত্রক: ভারত সরকার) বারাসত, ২৪ পরগনা।

৪। সমাজ কল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৪৫ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু, কলকাতা-১৩।

৫। অলকেন্দু বোধ নিকেতন, কাঁকুড়গাছি, ভি আই পি রোড, কলকাতা।

৬। আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, ১৪ রহিম ওস্তাগর লেন, কলকাতা-৪৫।

৭। ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রিসার্চ, প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, কলকাতা।

৮। কেয়ার অ্যান্ড কাউনসেলিং সেন্টার, ৭৬এ, চক্রবেড়িয়া রোড, কলকাতা-২০।

৯। বোধিপীঠ, ২০, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা-৯।

১০। মনোবিকাশ কেন্দ্র, ১১ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

১১। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্প্যাস্টিক সোসাইটি, সেনাছাউনী, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯।

১২। চাইল্ড গাইডেন্স সেন্টার, ৭, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-১২।

১৩। ব্যুরো অব সাইকোলজিক্যাল গাইডেন্স, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা-১৯।

১৪। মানস, মডার্ন স্কুল ফর বয়েজ, ১৭ বি, মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, কলকাতা-১৭।

১৫। সহমর্মী, ১০০ বি, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৭।

১৬। প্রবুদ্ধ, ৭০৯/১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-৩৪।

১৭। রাঘবেন্দ্র হোম ফর মেন্টালি রিটার্ডেড্ চিল্ড্রেন, রামরাজাতলা, হাওড়া।

১৮। রীচ, ২৪১, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮।

১৯। স্পীচ অ্যান্ড হীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১ বি, রিচি রোড, কলকাতা-১৯।

২০। সেন্ট জেভিয়ার্স জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, পোঃ বাসন্তী, ভায়া ক্যানিং, ২৪ পরগনা।

২১। রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডিয়া, পি ৯১, হেলেন কেলার সরণী, কলকাতা-৮৮।

২২। রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর চিলড্রেন, ৫৯, মতিলাল গুপ্ত রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮।

২৩। দি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি ফর দি হ্যাণ্ডিক্যাপ্ড, ৪৮, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা-৩৬।

২৪। রিজিওন্যাল আর্টিফিশিয়াল লিম্ব ফিটিং সেন্টার, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩৮, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪।

২৫। সোসাইটি ফর ওয়েলফেয়ার অব ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্ড, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

২৬। ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগনা।

২৭। ব্লাইন্ড স্কুল, ডায়মন্ডহারবার রোড, বেহালা, কলকাতা।

২৮। ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড, হেলেন কেলার সরণী, মাঝের হাট ব্রীজ, কলকাতা-৮৮।

২৯। লাইট হাউস ফর দি ব্লাইন্ড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৫।

৩০। ব্লাইন্ড পারসনস অ্যাসোসিয়েশন, বাপুজীনগর সোসাইটি, কলকাতা-৩২।

৩১। ওয়ার্কিং ইউনিট ফব সাইটলেস উইমেন, বারিন্দ্র পাড়া, পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগনা।

৩২। ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল, ২৯৩-এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৯।

৩৩। ডেফ স্কুল, সিউড়ি, বীরভূম।

৩৪। ডেফ স্কুল, পুরুলিয়া, পুরুলিয়া।

৩৫। মূকবধির বিদ্যালয়, বিজয়গড়, কলকাতা-৩২।

৩৬। আইডিয়াল স্কুল ফর দি ডেফ, ১২৪, আ. জ. চ. বসু রোড, কলকাতা-১৪।

৩৭। নিউ আলিপুর ডেফ স্কুল, নিউ আলিপুর, কলকাতা।

৩৮। ইছাপুর ডেফ স্কুল, ইছাপুর, ২৪-পরগনা।

৩৯। চিত্রবাণী, ৭৬, রফি আহম্মদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-১৬।

৪০। চেশায়ার হোম, ৫১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬।

৪১। সি. আই. এন. আই, পোঃ ও গ্রাম-পৈলান, ২৪-পরগনা।

৪২। ওয়ার্কশপ ফর দি ব্লাইন্ড, ৮ডি, দমদম রোড, কলকাতা-৩০।

৪৩। হোম ফর মেন্টালি রিটার্ডেড্, মিশনারিজ অব চ্যারিটি, নুরপুর, ২৪-পরগনা।

৪৪। আশা নিকেতন, ২০৩, এ. পি. সি. রোড, শিয়ালদহ, কলকাতা।

৪৫। ইউনিসেফ, ২৬, লী রোড, কলকাতা-২০।

৪৬। সেন্টার ফর হ্যান্ডিক্যাপ্ড চিলড্রেন, ইনস্টিটিউট এর চাইল্ড হেল্থ। ১১, ডাঃ বীরেশ গুহ রোড, কলকাতা-১৭।

৪৭। ইনস্টিটিউট ফর মেন্টালি রিটার্ডেড, চন্দননগর, হুগলী।

৪৮। জাতীয় বধির সম্মেলন, ১৮, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা।

৪৯। দি ওরাল স্কুল ফর দি ডেফ চিল্ড্রেন, ৪বি শর্ট স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

৫০। মূকবধির বিদ্যামন্দির, ২৬৫/১৯, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-৩৬।

৫১। কন্টাই ডেফ অ্যান্ড-ডাম্ব স্কুল, কাঁথী, মেদিনীপুর।

৫২। মহারানী নীলিমাপ্রভা ইনস্টিটিউট ফর দি ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

৫৩। সিউড়ি ডেফ অ্যান্ড-ডাম্ব স্কুল, সিউড়ী, বীরভূম স্যালভেশন আর্মি স্কুল ফর দি ডেফ, কালিম্পঙ্, দার্জিলিঙ্।

৫৪। মেরী স্কট্ হোম ফর দি ব্লাইন্ড, কালিম্পঙ্, দার্জিলিঙ্।

৫৫। সুইডিশ মিশন স্কুল ফর দি ব্লাইন্ড, ৫৬, কোচবিহার বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম, বিবেকনগর, চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর।
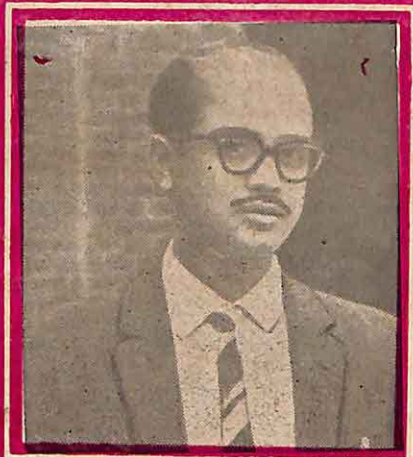
সনৎকুমার কর একজন অগ্রণী চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানী। জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৬ই জুলাই—হাওড়ার ফটিকগাছি গ্রামে এক প্রাচীন চিকিৎসক পরিবারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি। ব্যাঙ্গালোর সর্ব-ভারত মানসিক স্বাস্থ্য নিকেতনে দুবছর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শেষে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানে উচ্চতর উপাধি প্রাপ্ত।

শিক্ষাদান, গবেষণা ও মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কুড়ি বছরের। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, সেখানে ছাত্র-পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন এবং কলকাতায় মৃগী-রোগ নিয়ে গবেষণা এঁর উল্লেখ-যোগ্য কাজ। ১৯৭৭ সালে সি.এম.ডি.এ. পরিচালিত মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় অন্যতম অধীক্ষক।

বর্তমানে ইনি পি.জি. হাসপাতাল সংলগ্ন স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতনের বাক-শ্রুতি বিভাগ ছাড়া, সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল, প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায়তন ও মনোরোগী পুনর্বাসন ব্রতী কয়েকটি সংস্থার সংগে যুক্ত।

ভারতীয় চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানী সংঘের সদস্য। মানসিক ব্যাধি, মানস-মন্দন ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে নবতর আইন প্রবর্তনের একজন প্রবক্তা। নিজ বিষয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে গণচেতক প্রবন্ধ রচনায় নিরত এই লেখকের সর্বাধিক আগ্রহ মন-চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধী শিশুর পুনর্বাসনে।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী ■ কলিকাতা-৯